পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্ত্তার নূতন শিক্ষা-ধারা অনুসারে সমগ্র বিদ্যালয়ের
সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর উপপাঠ্যরূপে অনুমোদিত।
(কলিকাতা গেজেট, ৩রা মে, ১৯৫১)

'বঙ্কিম-গ্রন্থমালা'র ষষ্ঠ গ্রন্থ—

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের

কৃষ্ণকান্তের উইল

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

SRI KRISHNA BOOK HOUSE
Lucknow

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—
রথযাত্রা
১৩৬৩
৩

ছেপেছেন—
এস, সি, মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
এক টাকা

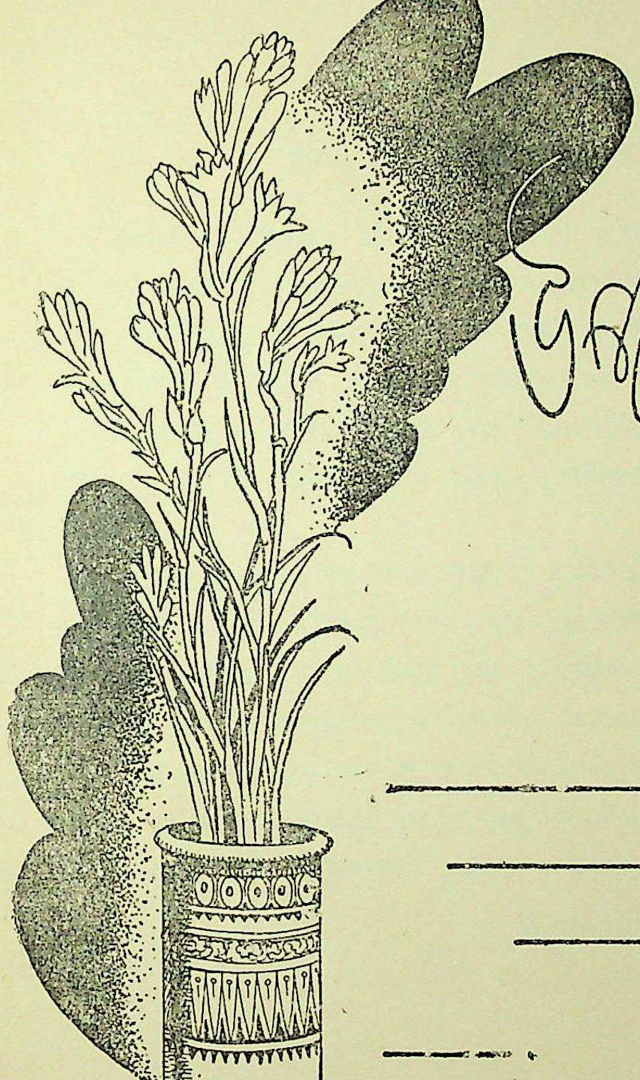

উপহার

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—
রথযাত্রা
১৩৬৩
৩

ছেপেছেন—
এস, সি, মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
এক টাকা

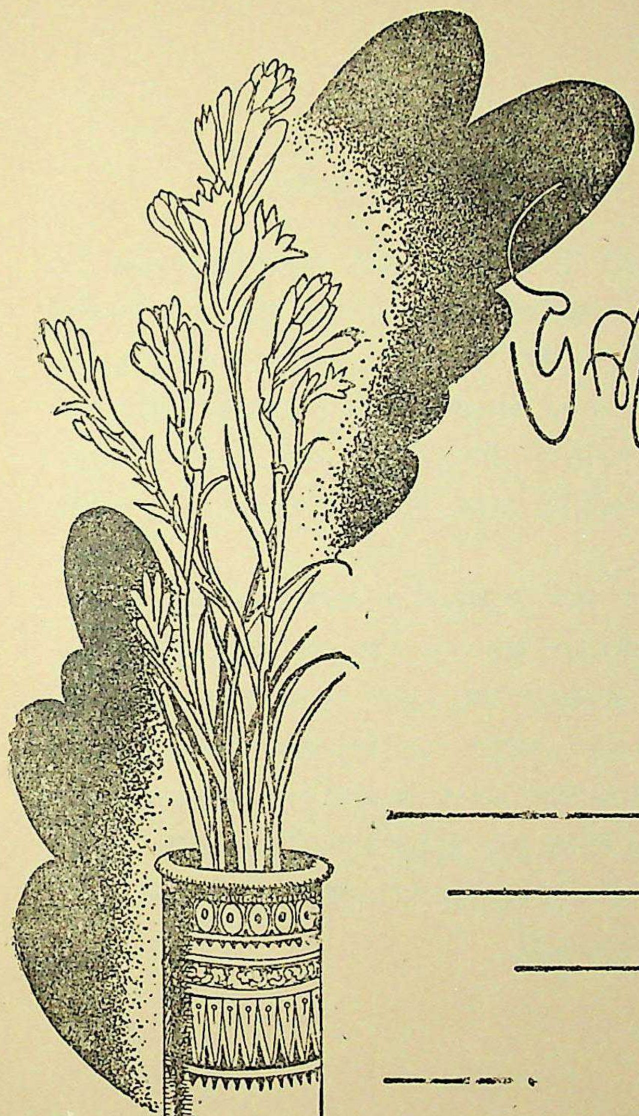

উপহার

সম্পাদকের ভূমিকা

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রধানতম সামাজিক উপন্যাস। জমিদার কৃষ্ণকান্ত এবং তাঁহার উইল যদিও এই বইটির নামের সঙ্গে সংযুক্ত, কিন্তু আসলে এই বইটিতে তাহাদের বাহিরে অপর তিনটি চরিত্রকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সেই তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়াই এই উপন্যাসের প্রাণবস্তু ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই তিনটি চরিত্র হইল, গোবিন্দলাল, রোহিণী ও ভ্রমর।

শেষোক্ত তিনটি চরিত্র বাংলা-সাহিত্যে অমর হইয়া আছে এবং এই তিনটি চরিত্রের জীবনের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মানব-মনের সব-চেয়ে সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃত ভালো-বাসা ও কামনার মধ্যে একটা বৃহৎ পার্থক্য আছে। প্রকৃত ভালো-বাসা নিজের জন্য কিছু চাহে না, কামনা নিতান্তই স্বার্থপর। কামনার হাতে মানুষ যখন নিজেকে ছাড়িয়া দেয়, তখনই সংসারে অনর্থ ঘটে। সেই কথাই তিনি এই উপন্যাসে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

যতদিন জগতে বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলাভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙালীর বুকে অমর হইয়া থাকিবেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়তো তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তবুও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সকলের উপরে থাকিবে। কারণ, তিনি যে শুধু জগতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক, তাই নয়, মানব-ইতিহাসে অতি অল্প-সংখ্যক এক-জাতের লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সভ্যতার রথ আগাইয়া চলে, ইংরেজীতে তাঁহাদের বলে Pioneer, বাংলাভাষায় আমরা বলি, 'পথিকৃৎ'—যাঁহারা পথ তৈরী করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্য এবং আমাদের জাতীয়-জীবনে সেই পথিকৃৎ।

তিনি যে পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'তিনি যে আমাদের জন্য শুধু পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়া গেলেন, তাহা নয়, চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অন্তরে যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একক-সম্রাটের মতন বসিয়া আছেন।

আজ থেকে একশো আঠারো বছর আগে নৈহাটীর কাছে কাঁটালপাড়া-গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন—১৮৩৮, ২৬শে জুন। নৈহাটী ষ্টেশনের মুখে ঢুকিতেই রেল-লাইনের ধারেই ভগ্নপ্রায় তাঁহার বাড়ী চোখে পড়ে। পিছনের দিক্‌টা ভাঙিয়া জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অথচ এই বাড়ীটিই আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটী-কলেক্টর ছিলেন। কাজ হইতে অবসর লইয়া তিনি কাঁটালপাড়াতেই বাস করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব সেখানেই অতিবাহিত হয়। ছেলেবেলায় তিনি

অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর তিনি 'ডবল প্রমোশন' পাইতেন—ছেলেবেলা হইতে আবৃত্তি করিতে খুব ভালোবাসিতেন।

মাত্র এগারো বৎসর বয়সে তিনি হুগলী-কলেজে ভর্ত্তি হন। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি সেকালের জুনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার দুই বৎসর পরে তিনি সিনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার দুই বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম এন্‌ট্রান্স ও বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম-দলে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম বি-এ পাশ ছাত্র। বি-এ পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার সময়েই তিনি ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়া যান এবং চাকরি করিতে-করিতে তিনি আইন-পরীক্ষা দেন।

তাহার পর ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রত্যেক জায়গাতেই বিচারক হিসাবে তাঁহার প্রচুর খ্যাতি হয়। সর্ব্বসময় তিনি আইনের মর্য্যাদা রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কাহাকেও খাতির করিতেন না। সেখানে তিনি এতটুকু অন্যায় সুবিধা, বা, সুযোগ কাহাকেও দিতেন না। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরকাল সগৌরবে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি করার পর তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী-কলেজে কিশোর ছাত্ররূপে তিনি সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার তের বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় বাংলা-সাহিত্যে একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি সে-সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। লোকে তাঁহার রসাল কবিতা ও ছড়া পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র মনে-মনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার মত কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি কাগজ ছিল। সেই কাগজের নাম, 'সংবাদ-প্রভাকর'।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম লেখা সেই 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলি সবই কবিতা।

তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্য একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল, তাহার ভাষা এমন আড়ষ্ট, সংস্কৃত অনুস্বার-বিসর্গ আর সমাসের এমন ছড়াছড়ি আর মাখামাখি যে, তাহাকে সাহিত্যই বলা চলে না। তাহার মধ্যে মাত্র একজন সাহিত্যিক তখন কথ্য-ভাষায় গদ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার নাম, টেকচাঁদ ঠাকুর। সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করিলেন, তাহার ভাষা, বিন্যাস এবং ভাব দেখিয়া বাঙালী বিমোহিত হইয়া গেল।

সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষার মাঝামাঝি তিনি এমন অপরূপ এক গদ্য-ভাষা সৃষ্টি করিলেন, যাহার ছন্দে বাংলা-সাহিত্যে নতুন যুগের সৃষ্টি হইল। ভাষার যে এমন গতি থাকিতে পারে, ভাষার যে প্রাণ থাকিতে পারে, গদ্য-সাহিত্যেরও যে একটা ছন্দ আছে, সেই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত হইল। তারপর নির্ঝরিণী-ধারার মত বঙ্কিমচন্দ্র একটার পর একটা উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা প্রভৃতি একটির পর একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

উপন্যাস ছাড়া, তিনি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাঙালীর চেতনা জাগাইবার জন্য নানারকম নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবন তখন ঘন অন্ধকারে লীন। তাহার ইতিহাস নাই, জাতীয় গৌরব-সম্বন্ধে চেতনা নাই, সমাজে অসংখ্য ত্রুটি ও অন্যায়, রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে সে পরাধীন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন···বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমাদের জাতীয়-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবনের সমস্ত অভাব ও দৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহিত্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল, সব দিক্ হইতে বাঙালীর চেতনাকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন।

বঙ্কিমের প্রধান অসুবিধা ছিল যে, তিনি সরকারী-চাকুরে। বিশেষ করিয়া সে-যুগে বৃটিশ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন-কিছু বলা, বা করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই বিরূপ অবস্থার মধ্য হইতে তিনি এই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিলেন, 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, পরাধীন জাতির মুখে তাহার জাগরণ-মন্ত্রকে তুলিয়া দিলেন—"বন্দে মাতরম্!"

অন্ধকার অরণ্যের মধ্য হইতে তিনি স্বহস্তে ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া প্রশস্ত পথ তৈয়ার করিয়া দিয়া গেলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন। সেই পথ ধরিয়াই আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি। তাঁহার 'কমলাকান্ত' মাতৃ-রূপের যে স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, আমাদের জীবনে আজ সে-স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সেই সময়ের মধ্যে বিপুল রাজকার্য্য সগৌরবে সম্পন্ন করিয়া, তিনি এই জাতির পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভার একা স্বহস্তে সরাইয়া গিয়াছেন।

বাঙালীর নব-জন্মদাতা···সাহিত্যিক-গুরু, তোমাকে প্রণাম!

—বন্দে মাতরম্!

———

কৃষ্ণকান্তের উইল

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিদ্রাগ্রামে এক-ঘর বড় জমিদার ছিলেন। জমিদারবাবুর নাম —কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী। তাঁহার জমিদারীর মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জ্জিত। উভয় ভ্রাতা একত্র হইয়া ধনোপার্জ্জন করেন। উভয় ভ্রাতায় পরম সম্প্রীতি ছিল, একের মনে এমন সন্দেহ কস্মিন্‌কালে জন্মে নাই যে, তিনি অপর কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমিদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়ে একান্নভুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার নাম—গোবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি রামকান্ত রায়ের মনে-মনে সঙ্কল্প হইল যে, উভয়ের উপার্জ্জিত বিষয় একের নামে আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার বিহিত লেখাপড়া করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কেননা, যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত ছিল যে, কৃষ্ণকান্তের কখনও প্রবঞ্চনা অথবা তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করার সম্ভাবনা নাই, তথাপি কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাঁহার পুত্রেরা কি করে, তাহার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু লেখাপড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না—আজি বলিব, কালি বলিব করিতে লাগিলেন। একদা প্রয়োজন-বশতঃ তালুকে গেলে, সেইখানে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

যদি কৃষ্ণকান্ত এমন অভিলাষ করিতেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইলে তৎসাধনপক্ষে এখন আর কোন বিঘ্ন ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি গোবিন্দলালকে আপন সংসারে আপন পুত্রদিগের সহিত সমানভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং উইল করিয়া আপনাদিগের উপার্জ্জিত সম্পত্তির যে-অর্দ্ধাংশ ন্যায়মত রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুই পুত্র আর এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম—হরলাল, কনিষ্ঠের নাম—বিনোদলাল, কন্যার নাম—শৈলবতী। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে, তাঁহার পরলোকান্তে গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা আর শৈলবতী এক আনা সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন।

হরলাল বড় দুর্দ্দান্ত; পিতার অবাধ্য এবং দুর্ম্মুখ। বাঙালীর উইল প্রায় গোপন থাকে না। উইলের কথা হরলাল জানিতে পারিল। হরলাল দেখিয়া-শুনিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পিতাকে কহিল, "এটা কি হইল? গোবিন্দলাল অর্দ্ধেক ভাগ পাইল, আর আমার—তিন আনা?"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "ইহা ন্যায্য হইয়াছে। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়াছি।"

হর। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্যটা কি? আমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি সে লইবার কে? আর, মা-বোনকে আমরা প্রতিপালন করিব—তাহাদিগের-বা এক-এক আনা কেন? বরং তাহাদিগকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী বলিয়া লিখিয়া যান।

কৃষ্ণকান্ত কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বাপু হরলাল, বিষয় আমার, তোমার নহে। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়া যাইব।"

হর। আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, আপনাকে যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে দিব না।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে চক্ষু আরক্ত করিয়া কহিলেন, "হরলাল, তুমি যদি বালক হইতে, তবে আজি তোমাকে গুরুমহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম।"

হর। আমি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের গোঁফ পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব।

কৃষ্ণকান্ত রায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বহস্তে উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তৎপরিবর্ত্তে নূতন একখানি উইল লিখাইলেন। তাহাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদলাল পাঁচ আনা, কর্ত্রী এক আনা, শৈলবতী এক আনা, আর হরলাল এক আনা মাত্র পাইলেন।

রাগ করিয়া হরলাল পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গেলেন, তথা হইতে পিতাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই ঃ

"কলিকাতায় পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি মানস করিয়াছি যে, একটি বিধবাবিবাহ করিব। আপনি যদ্যপি উইল পরিবর্ত্তন করিয়া আমাকে আট আনা লিখিয়া দেন, আর সেই উইল শীঘ্র রেজেষ্টারি করেন, তবেই এ অভিলাষ ত্যাগ করিব, নচেৎ শীঘ্র একটি বিধবাবিবাহ করিব।"

হরলাল মনে করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকান্ত ভয়ে ভীত হইয়া, উইল পরিবর্ত্তন করিয়া, হরলালকে অধিক বিষয় লিখিয়া দিবেন।

কিন্তু কৃষ্ণকান্তের যে উত্তর পাইলেন তাহাতে সে ভরসা রহিল না। কৃষ্ণকান্ত লিখিলেন ঃ

"তুমি আমার ত্যাজ্যপুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিবাহ করিতে পারো। আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ করিলে আমি উইল বদলাইব বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না।"

ইহার কিছু পরেই হরলাল সংবাদ পাঠাইলেন যে, বিধবাবিবাহ করিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্ত রায় আবার উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নূতন উইল করিবেন।

পাড়ায় ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নামে একজন নিরীহ ভালোমানুষ লোক বাস করিতেন। কৃষ্ণকান্তকে জ্যেঠামহাশয় বলিতেন এবং তৎকর্ত্তৃক অনুগৃহীত এবং প্রতিপালিতও হইতেন।

ব্রহ্মানন্দের হস্তাক্ষর উত্তম। এ-সকল লেখাপড়া তাঁহার দ্বারাই হইত। কৃষ্ণকান্ত সেইদিন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "আহারাদির পর এখানে আসিও, নূতন উইল লিখিয়া দিতে হইবে।"

বিনোদলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, "আবার উইল বদলানো হইবে কি অভিপ্রায়ে?"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "এবার তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে শূন্য পড়িবে।"

বিনোদ। ইহা ভালো হয় না। তিনিই যেন অপরাধী, কিন্তু তাঁহার একটি পুত্র আছে—সে শিশু, নিরপরাধ। তাহার উপায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। তাহাকে এক পাই লিখিয়া দিব।

বিনোদ। এক পাই বখরায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। আমার আয় দুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বখরায় তিন হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে এক জন গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চলিতে পারে। ইহার অধিক দিব না।

বিনোদলাল অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কর্ত্তা কোনমতে মতান্তর করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মানন্দ স্নানাহার করিয়া নিদ্রার উদ্যোগে ছিলেন, এমন সময় বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন যে, হরলাল রায়। হরলাল আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিলেন।

ব্রহ্মা। সে কি, বড়বাবু যে! কখন্ বাড়ী এলে?

হর। বাড়ী এখনও যাই নাই।

ব্র। একেবারে এইখানেই? কলিকাতা হইতে কতক্ষণ আসিতেছ?

হর। কলিকাতা হইতে দুই দিবস হইল আসিয়াছি। এই দুইদিন কোনো স্থানে লুকাইয়াছিলাম। আবার নাকি নূতন উইল হইবে?

ব্র। এইরকম তো শুনিতেছি।

হর। আমার ভাগে এবার শূন্য।

ব্র। কর্ত্তা এখন রাগ ক'রে তাই বলছেন, কিন্তু সেটা থাকবে না।

হর। আজি বিকালে লেখাপড়া হবে? তুমি লিখিবে?

ব্র। তা কি করবো ভাই! কর্ত্তা বলিলে তো 'না' বলিতে পারিব না।

হর। ভালো, তাতে তোমার দোষ কি? এখন কিছু রোজগার করিবে?

ব্র। কিল্‌টে-চড়টা? তা ভাই, মারো না কেন?

হর। তা নয়; হাজার টাকা।

ব্র। বিধবা বিয়ে করে না কি?

হর। তাই।

ব্র। বয়স গেছে।

হর। তবে আর-একটি কাজ বলি, এখনই আরম্ভ করো। আগাম কিছু গ্রহণ করো।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দের হাতে হরলাল পাঁচশত টাকার নোট দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ নোট পাইয়া উল্‌টিয়া-পালটিয়া বলিলেন, "ইহা লইয়া আমি কি করিব?"

হর। পুঁজি করিও, দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও।

ব্র। গোয়ালা-ফোয়ালার কোনো এলাকা রাখি না। কিন্তু আমায় করিতে হইবে কি?

হর। দুইটি কলম কাটো। দুইটি যেন ঠিক সমান হয়।

ব্র। আচ্ছা ভাই—যাহা বলো, তাই শুনি।

এই বলিয়া ঘোষজা মহাশয় দুইটি নূতন কলম লইয়া ঠিক সমান

কৃষ্ণকান্তের উইল—

—ভ্রমর লাথি মারিয়া অলঙ্কারগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। রোহিণী বলিল, "সোনায় পা দিতে নাই।"—

৬০ পৃষ্ঠা

করিয়া কাটিলেন এবং লিখিয়া দেখিলেন যে, দুইটিরই লেখা একপ্রকার দেখিতে হয়। তখন হরলাল বলিলেন, "ইহার একটি কলম বাক্সেতে তুলিয়া রাখো। যখন উইল লিখিতে যাইবে, এই কলম লইয়া গিয়া ইহাতেই উইল লিখিবে। দ্বিতীয় কলমটি লইয়া এখন একখানা লেখাপড়া করিতে হইবে। তোমার কাছে ভালো কালি আছে?"

ব্রহ্মানন্দ মসীপাত্র বাহির করিয়া লিখিয়া দেখাইলেন। হরলাল বলিতে লাগিলেন, "ভালো, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া যাইও।"

ব্র। তোমাদের বাড়ীতে কি দোয়াত-কলম নাই যে, আমি ঘাড়ে করিয়া নিয়া যাবো?

হর। আমার কোনো উদ্দেশ্য আছে—নচেৎ তোমাকে এত টাকা দিলাম কেন?

ব্র। আমিও তাই ভাবিতেছি বটে, ভালো বলেছো ভাই রে!

হর। তুমি দোয়াত-কলম লইয়া গেলে কেহ ভাবিলেও ভাবিতে পারে, আজি এটা কেন? তুমি সরকারী কালি-কলমকে গালি পাড়িও; তাহা হইলে শোধরাইবে।

ব্র। তা সরকারী কালি-কলমকে শুধু কেন? সরকারকে সুদ্ধ গালি পাড়িতে পারিব।

হর। এত আবশ্যক নাই। এক্ষণে আসল কর্ম্ম আরম্ভ করো।

তখন হরলাল দুইখানি জেনারেল লেটার কাগজ ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "এ যে, সরকারী-কাগজ দেখিতে পাই।"

"সরকারী নহে—কিন্তু উকীলের বাড়ীর লেখাপড়া এই কাগজে হইয়া থাকে। কর্ত্তাও এই কাগজে উইল লেখাইয়া থাকেন, জানি।

এজন্য এই কাগজ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। যাহা বলি তাহা এই কালি-কলমে লেখো।”

ব্রহ্মানন্দ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। হরলাল একখানি উইল লেখাইয়া দিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই,—কৃষ্ণকান্ত রায় উইল করিতেছেন। তাঁহার নামে যত সম্পত্তি আছে, তাহার বিভাগ কৃষ্ণকান্তের পরলোকান্তে এইরূপ হইবে। যথা—বিনোদলাল তিন আনা, গোবিন্দলাল এক পাই, গৃহিণী এক পাই, শৈলবতী এক পাই, হরলালের পুত্র এক পাই, হরলাল জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া অবশিষ্ট বারো আনা।

লেখা হইলে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, “এখন তো উইল লেখা হইল, দস্তখত করে কে?”

“আমি” বলিয়া হরলাল ঐ উইলে কৃষ্ণকান্ত রায়ের এবং চারি জন সাক্ষীর দস্তখত করিয়া দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, “ভালো, এ তো জাল উইল।”

হর। এই সাঁচ্চা উইল, বৈকালে যাহা লিখিবে, সেই জাল।

ব্র। কিসে?

হর। তুমি যখন উইল লিখিতে যাইবে, তখন এই উইলখানি আপনার এই পিরাণের পকেটে লুকাইয়া লইয়া যাইবে। সেখানে গিয়া এই কালি-কলমে তাঁহাদের ইচ্ছামত উইল লিখিবে। কাগজ, কলম, কালি, লেখক একই; সুতরাং দুইখানি উইল দেখিতে একপ্রকার হইবে। পরে উইল পড়িয়া শুনানো ও দস্তখত হইয়া গেলে শেষে তুমি স্বাক্ষর করিবার জন্য লইবে। সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দস্তখত করিবে। সেই অবকাশে উইলখানি বদলাইয়া

লইবে। এইখানি কর্ত্তাকে দিয়া, কর্ত্তার উইলখানি আমাকে আনিয়া দিবে।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ ভাবিতে লাগিলেন; বলিলেন, "বলিলে কি হয়—বুদ্ধির খেলাটা খেলেছো ভালো।"

হর। ভাবিতেছ কি?

ব্র। ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু ভয় করে। তোমার টাকা ফিরাইয়া লও। আমি কিন্তু জালের মধ্যে থাকিব না।

"টাকা দাও।" বলিয়া হরলাল হাত পাতিলেন। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নোট ফিরাইয়া দিলেন। নোট লইয়া হরলাল উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ তখন আবার তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বলি, ভায়া কি গেলে?"

"না" বলিয়া হরলাল ফিরিলেন।

ব্র। তুমি এখন পাঁচ শত টাকা দিলে। আর কি দিবে?

হর। তুমি সে উইলখানি আনিয়া দিলে আর পাঁচ শত দিব।

ব্র। অনেকটা টাকা—লোভ ছাড়া যায় না।

হর। তবে তুমি রাজী হইলে?

ব্র। রাজী না হইয়াই-বা কি করি? কিন্তু বদল করি কি প্রকারে? দেখিতে পাইবে যে।

হর। কেন দেখিতে পাইবে? আমি তোমার সম্মুখে উইল বদল করিয়া লইতেছি, তুমি দেখ দেখি, টের পাও কি না?

হরলালের অন্য বিদ্যা থাকুক না-থাকুক, হস্ত-কৌশল বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন উইলখানি পকেটে রাখিলেন, আর, একখানি কাগজ হাতে লইয়া তাহাতে লিখিবার

উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে হাতের কাগজ পকেটে, পকেটের কাগজ হাতে কি-প্রকারে আসিল, ব্রহ্মানন্দ তাহা কিছুই লক্ষিত করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দ হরলালের হস্ত-কৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরলাল বলিলেন, "এই কৌশলটি তোমায় শিখাইয়া দিব।" এই বলিয়া হরলাল সেই অভ্যস্ত-কৌশল ব্রহ্মানন্দকে অভ্যাস করাইতে লাগিলেন।

দুই তিন দণ্ডে ব্রহ্মানন্দের সেই কৌশলটি অভ্যস্ত হইল। তখন হরলাল কহিলেন যে, "আমি এক্ষণে চলিলাম। সন্ধ্যার পর বাকি টাকা লইয়া আসিব।" বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

হরলাল চলিয়া গেলে, ব্রহ্মানন্দের বিষম ভয় সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন যে, তিনি যে-কার্য্যে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা রাজদ্বারে মহা দণ্ডার্হ অপরাধ—কি জানি, ভবিষ্যতে পাছে তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইতে হয়। আবার বদলের সময় যদি কেহ ধরিয়া ফেলে? তবে তিনি এ-কার্য্য কেন করেন? না করিলে হস্তগত সহস্র মুদ্রা ত্যাগ করিতে হয়। তাহাও হয় না। প্রাণ থাকিতে নয়। হরলালের এ-টাকা হজম করা ভার;—জেলখানার ভয় আছে; কিন্তু ত্যাগ করাও যায় না। লোভ বড়, কিন্তু বদহজমের ভয়ও বড়। ব্রহ্মানন্দ মীমাংসা করিতে পারিলেন না। মীমাংসা করিতে না পারিয়া অবশেষে ব্রহ্মানন্দ টাকা রাখাই স্থির করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দ উইল লিখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন যে, হরলাল আসিয়া বসিয়া আছেন। হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল ?"

ব্র। ভাই, কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল।

হর। পারো নাই ?

ব্র। না ভাই—এই ভাই তোমার জাল উইল নাও। এই তোমার টাকা।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ কৃত্রিম উইল ও বাক্স হইতে পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। ক্রোধে এবং বিরক্তিতে হরলালের চক্ষু আরক্ত এবং অধর কম্পিত হইল। বলিলেন, "মূর্খ, অকর্ম্মা স্ত্রীলোকের কাজটাও তোমা হইতে হইল না ? আমি চলিলাম। কিন্তু দেখিও, যদি তোমা হইতে এই কথার বাষ্পমাত্র প্রকাশ পায়, তবে তোমার জীবন সংশয়।"

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "সে ভাবনা করিও না। কথা আমার নিকট হইতে প্রকাশ পাইবে না।"

হরলাল সেখান হইতে উঠিয়া ব্রহ্মানন্দের পাকশালায় গেলেন। হরলাল ঘরের ছেলে, সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতে পারেন। পাকশালায় ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতৃকন্যা রোহিণী রাঁধিতেছিল।

রোহিণী অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত,

হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত। এদিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদী-বিশেষ বলিলে হয়। ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলিপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত।

রোহিণী রূপসী ঠন্-ঠন্ করিয়া দালের হাঁড়িতে কাঠি দিতেছিল, এমন সময় হরলালবাবু জুতাসমেত মস্-মস্ করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। রোহিণী দালের কাঠি ফেলিয়া দিয়া, হাত ধুইয়া, মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নখে নখ খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-কাকা কবে এলেন?"

হরলাল বলিলেন, "কাল এসেছি। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

রোহিণী শিহরিল; বলিল, "আজি এখানে খাবেন? সোরু চালের ভাত চড়াবো কি?"

হর। চড়াও, চড়াও; কিন্তু সে কথা নয়। তোমার একদিনের কথা মনে পড়ে কি?

রোহিণী চুপ করিয়া মাটিপানে চাহিয়া রহিল। হরলাল বলিলেন, "সেইদিন, যেদিন তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে যাত্রীদিগের দলছাড়া হইয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলে—মনে পড়ে?"

রোহিণী। মনে পড়ে।

হর। যেদিন তুমি পথ হারাইয়া মাঠে পড়িয়াছিলে—মনে পড়ে?

রো। পড়ে।

হর। যেদিন মাঠে তোমার রাত্রি হইল, তুমি একা—জনকতক বদমাস তোমার সঙ্গ নিল—মনে পড়ে ?

রো। পড়ে।

হর। সেইদিন কে তোমায় রক্ষা করিয়াছিল ?

রো। তুমি। তুমি ঘোড়ার উপরে সেই মাঠ দিয়া কোথায় যাইতেছিলে—

হর। শালীর বাড়ী।

রো। তুমি দেখিতে পাইয়া আমায় রক্ষা করিলে—আমায় পাল্কী-বেহারা করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলে। মনে পড়ে বই কি! সে ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না!

হর। আজ সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারো—তার উপর আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিতে পারো—করিবে ?

রো। কি বলুন—আমি প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব।

হর। করো না-করো, এ-কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

রো। প্রাণ থাকিতেও নয়।

হর। দিব্য করো।

রোহিণী দিব্য করিল।

তখন হরলাল কৃষ্ণকান্তের আসল উইল ও জাল উইলের কথা বুঝাইয়া বলিলেন; শেষ বলিলেন, "সেই আসল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল ইহার বদলে রাখিয়া আসিতে হইবে। আমাদের বাটীতে তোমাদের যাতায়াত আছে, তুমি অনায়াসে পারো। আমার জন্য ইহা করিবে ?"

রোহিণী শিহরিল; বলিল, "চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না।"

হর। স্ত্রীলোক এমন অসারই বটে—কথার রাশি মাত্র। এই বুঝি, এজন্মে তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না?

রো। আর যা বলুন, সব পারিব। মরিতে বলেন মরিব; কিন্তু এ বিশ্বাসঘাতকের কাজ পারিব না।

হরলাল কিছুতেই রোহিণীকে সম্মত করিতে না পারিয়া সেই হাজার টাকার নোট রোহিণীর হাতে দিতে গেলেন। বলিলেন, "এই হাজার টাকা পুরস্কার আগাম নাও। এ কাজ তোমায় করিতে হইবে।"

রোহিণী নোট লইল না। বলিল, "টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্ত্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না। করিবার হইত তো আপনার কথাতেই করিতাম।"

হরলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, "মনে করিয়াছিলাম, রোহিণী! তুমি আমার হিতৈষী। পর কখনও আপন হয়? দেখ, আজ যদি আমার স্ত্রী থাকিত, আমি তোমার খোসামোদ করিতাম না। সেই আমার এ-কাজ করিত।"

এবার রোহিণী একটু হাসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিলে যে?"

রো। আপনার স্ত্রীর নামে সেই বিধবাবিবাহের কথা মনে পড়িল। আপনি নাকি বিধবাবিবাহ করিবেন?

হর। ইচ্ছা তো আছে—কিন্তু মনের মত বিধবা পাই কই?

রো। তা, বিধবাই হোক আর সধবাই হোক—বলি, বিধবাই

হোক, কুমারীই হোক—একটা বিবাহ করিয়া সংসারী হইলে ভালো হয়। আমরা আত্মীয়-স্বজন, সকলেরই তাহ'লে আহ্লাদ হয়।

হর। দেখ রোহিণী, বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-সম্মত।

রো। তা তো এখন লোকে বলিতেছে।

হর। দেখ, তুমিও একটা বিবাহ করিতে পারো—কেন করিবে না?

রোহিণী মাথার কাপড় একটু টানিয়া মুখ ফিরাইল। হরলাল বলিতে লাগিলেন, "দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম-সুবাদ মাত্র—সম্পর্কে বাধে না।"

এবার রোহিণী লম্বা করিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, উনুন-গোড়ায় বসিয়া ডালে কাঠি দিতে আরম্ভ করিল।

দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া হরলাল ফিরিয়া চলিলেন।

হরলাল দ্বার পর্য্যন্ত গেলে, রোহিণী বলিল, "কাগজখানা নাহয় রাখিয়া যান, দেখি কি করিতে পারি।"

হরলাল আহ্লাদিত হইয়া জাল উইল ও নোট রোহিণীর নিকটে রাখিলেন। দেখিয়া রোহিণী বলিল, "নোট—না। শুধু উইলখানা রাখুন।"

হরলাল তখন জাল উইল রাখিয়া নোট লইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐ দিবস রাত্রি আটটার সময় কৃষ্ণকান্ত রায় আপন শয়ন-মন্দিরে পর্য্যঙ্কে বসিয়া, উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, শট্‌কায় তামাক টানিতেছিলেন এবং সংসারে একমাত্র ঔষধ—মাদক-মধ্যে শ্রেষ্ঠ অহিফেন ওরফে আফিমের নেশায় মিঠে-রকম ঝিমাইতেছিলেন। ঝিমাইতে-ঝিমাইতে খেয়াল দেখিতেছিলেন, যেন উইলখানি হঠাৎ বিক্রয়-কোবলা হইয়া গিয়াছে। যেন হরলাল তিন টাকা তের আনা দু-কড়া দু-ক্রান্তি মূল্যে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি কিনিয়া লইয়াছে। আবার যেন কে বলিয়া দিল যে, 'না, এ দানপত্র নহে, তমসুক।' তখনই যেন দেখিলেন যে, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া, বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক-কৌটা আফিম কর্জ্জ লইয়া এই দলিল লিখিয়া দিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন—মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোরক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এমন সময়ে রোহিণী ধীরে-ধীরে সেই গৃহ-মধ্যে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা কি ঘুমাইয়াছ?"

কৃষ্ণকান্ত ঝিমাইতে-ঝিমাইতে কহিলেন, "কে, নন্দী? ঠাকুরকে এইবেলা ফোরক্লোজ করিতে বলো।"

রোহিণী বুঝিল যে, কৃষ্ণকান্তের আফিমের আমল হইয়াছে। হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, নন্দী কে?"

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় না তুলিয়া বলিলেন, "হুম, ঠিক বলেছো! বৃন্দাবনে গোয়ালা-বাড়ী মাখন খেয়েছে—আজও তার কড়ি দেয় নাই।"

রোহিণী খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণকান্তের চমক হইল, মাথা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কে ও, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী?"

রোহিণী উত্তর করিল, "মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা।"

কৃষ্ণ। অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী।

রো। ঠাকুরদাদা! আমি কি তোমার কাছে জ্যোতিষ শিখতে এসেছি?

কৃষ্ণ। তাই তো। তবে কি মনে করিয়া? আফিম চাই না তো?

রো। যে সামগ্রী প্রাণ ধ'রে দিতে পারবে না, তাহার জন্য কি আমি এসেছি? আমাকে কাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই এসেছি।

কৃষ্ণ। এই—এই! তবে আফিমেরই জন্য।

রো। না, ঠাকুরদাদা, না। তোমার দিব্য—আফিম চাই না। কাকা বল্‌লেন যে, যে-উইল আজ লেখাপড়া হয়েছে, তাতে তোমার দস্তখত হয় নাই!

কৃষ্ণ। সে কি? আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে, আমি দস্তখত করিয়াছি।

রো। না, কাকা বলিলেন যে, তাঁর যেন স্মরণ হচ্ছে, তাতে তুমি দস্তখত করো নাই; ভালো, সন্দেহ রাখার দরকার কি? তুমি কেন সেখানা খুলে একবার দেখ না!

কৃষ্ণ। বটে—তবে আলোটা ধরো দেখি।

বলিয়া কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া উপাধানের নিম্ন হইতে একটি চাবি লইলেন। রোহিণী নিকটস্থ দীপ হস্তে লইল। কৃষ্ণকান্ত প্রথমে

একটি ক্ষুদ্র হাতবাক্স খুলিয়া একটি বিচিত্র চাবি লইয়া পরে একটা চেষ্ট-ড্রয়ারের একটি দেরাজ খুলিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া ঐ উইল বাহির করিলেন। পরে বাক্স হইতে চশমা বাহির করিয়া নাসিকার উপর সংস্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চশমা লাগাইতে-লাগাইতে দুই-চারিবার আফিমের ঝিম্‌কিনি আসিল—সুতরাং তাহাতে কিছু কাল-বিলম্ব হইল। পরিশেষে চশমা সুস্থির হইলে কৃষ্ণকান্ত উইলে নেত্রপাত করিয়া দেখিয়া কহিলেন, "রোহিণী, আমি কি বুড়া হইয়া বিহ্বল হইয়াছি? এই দেখ, আমার দস্তখত।"

রোহিণী বলিল, "বালাই, বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল জোর করিয়া নাতিনী বল বই তো না। তা ভালো, আমি এখন যাই, কাকাকে বলি গিয়া।"

রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের শয়ন-মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

* * * *

গভীর নিশীথে কৃষ্ণকান্ত নিদ্রা যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, তাঁহার শয়নগৃহে দীপ জ্বলিতেছে না। সচরাচর সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বলিত; কিন্তু সে-রাত্রে দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে দেখিলেন। নিদ্রাভঙ্গকালে এমনও শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল যে, যেন কে একটা চাবি কলে ফিরাইল। এমনও বোধ হইল, যেন ঘরে কে মানুষ বেড়াইতেছে। মানুষ তাঁহার পর্য্যঙ্কের শিরোদেশ পর্য্যন্ত আসিল,—তাঁহার বালিশে হাত দিল। কৃষ্ণকান্ত আফিমের নেশায় বিভোর, না নিদ্রিত, না জাগরিত, বড়-কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ঘরে যে আলো নাই—তাহাও ঠিক বুঝেন নাই, কখনো অর্দ্ধনিদ্রিত, কখনো অর্দ্ধ-সচেতন,—সচেতনও

চক্ষু খুলে না। একবার দৈবাৎ চক্ষু খুলায় কতকটা অন্ধকার বোধ হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখন মনে করিতেছিলেন যে, তিনি হরি ঘোষের মোকদ্দমায় জাল দলিল দাখিল করায়, জেলখানায় গিয়াছেন। জেলখানা ঘোরান্ধকার, কিন্তু পরে হঠাৎ যেন চাবি-খোলার শব্দ অল্প কানে গেল। এ কি—জেলের চাবি পড়িল? হঠাৎ একটু চমক হইল। কৃষ্ণকান্ত শট্‌কা হাতড়াইলেন, পাইলেন না—অভ্যাসবশতঃ ডাকিলেন, "হরি!"

কৃষ্ণকান্ত অন্তঃপুরে শয়ন করিতেন না—বহির্ব্বাটীতেও শয়ন করিতেন না। উভয়ের মধ্যে একটি ঘর ছিল; সেই ঘরে শয়ন করিতেন। সেখানে হরি নামক একজন খানসামা তাঁহার প্রহরি-স্বরূপ শয়ন করিত। আর কেহ না। কৃষ্ণকান্ত তাহাকেই ডাকিলেন, "হরি!"

কৃষ্ণকান্ত বারেকমাত্র হরিকে ডাকিয়া আবার আফিমে ভোর হইয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আসল উইল তাঁহার গৃহ হইতে সেই অবসরে অন্তর্হিত হইল। জাল উইল তৎপরিবর্ত্তে স্থাপিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে রোহিণী আবার রাঁধিতে বসিয়াছে, আবার হরলাল সেখানে উঁকি মারিতেছেন, ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মানন্দ বাড়ী ছিলেন না, নহিলে কি একটা মনে করিতে পারিতেন।

হরলাল ধীরে-ধীরে রোহিণীর কাছে গেলেন—রোহিণী বড় চাহিয়া দেখে না। হরলাল বলিলেন, "চাহিয়া দেখ, হাঁড়ি ফাটিবে না।"

রোহিণী চাহিয়া দেখিয়া—হাসিল। হরলাল বলিলেন, "কি করিয়াছ?"

রোহিণী অপহৃত উইল আনিয়া হরলালকে দেখিতে দিল। হরলাল পড়িয়া দেখিলেন—আসল উইল বটে। তখন সে দুষ্টের মুখে হাসি ধরে না। উইল হাতে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি-প্রকারে আনিলে?"

রোহিণী সে-গল্প আরম্ভ করিল। প্রকৃত কিছুই বলিল না। একটি মিথ্যা উপন্যাস বলিতে লাগিল—বলিতে-বলিতে সে হরলালের হাত হইতে উইলখানি লইয়া দেখাইল, কি-প্রকারে কাগজখানি একটা কলমদানের ভিতর পড়িয়াছিল। উইল-চুরির কথা শেষ হইলে রোহিণী হঠাৎ উইলখানি হাতে করিয়া উঠিয়া গেল। যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার হাতে উইল নাই দেখিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "উইল কোথায় রাখিয়া আসিলে?"

রোহিণী। তুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

হর। আর তুলিয়া রাখিয়া কি হইবে? আমি এখনই যাইব।

রো। এখনই যাইবে ? এত তাড়াতাড়ি কেন ?

হর। আমার থাকিবার যো নাই।

রো। তা যাও।

হর। উইল ?

রো। আমার কাছে থাক্।

হর। সে কি ? উইল আমায় দিবে না ?

রো। তোমার কাছে থাকাও যে, আমার কাছে থাকাও সে।

হর। যদি আমাকে উইল দিবে না, তবে উহা চুরি করিলে কেন ?

রো। আপনারই জন্য। আপনারই জন্য ইহা রহিল ! যখনি আপনি বিধবা বিবাহ করিবেন, আপনার স্ত্রীকে এ উইল দিব। আপনি ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।

হরলাল বুঝিলেন ; বলিলেন, "তা হবে না—রোহিণী, টাকা যাহা চাও দিব।"

রো। লক্ষ টাকা দিলেও নয়। যাহা দিবে বলিয়াছিলে, তাই চাই।

হর। তা হয় না। আমি জাল করি, চুরি করি, আপনারই হকের জন্য। তুমি চুরি করিয়াছ, কার হকের জন্য ?

রোহিণীর মুখ শুকাইল। রোহিণী অধোবদনে রহিল।

হরলাল বলিতে লাগিলেন, "আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।"

রোহিণী সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া মাথার-কাপড় উঁচু করিয়া তুলিয়া,

হরলালের মুখপানে চাহিল; বলিল, "আমি চোর! তুমি সাধু! কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল? সরলা স্ত্রীলোক দেখিয়া প্রবঞ্চনা করিল? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, যে মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, যা ইতরে-বর্ব্বরে মুখেও আনিতে পারে না, তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে। হায়-হায়! আমি তোমার অযোগ্য? তোমার মত নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়েমানুষ হইতে, তোমাকে আজ···যা দিয়া ঘর ঝাঁট দিই, তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষমানুষ, মানে-মানে দূর হও!"

হরলাল বুঝিলেন, উপযুক্ত হইয়াছে। আর উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সে-স্থান হইতে বিদায় হইলেন; যাইবার সময়, একটু টিপিটিপি হাসিয়া গেলেন। রোহিণীও বুঝিল যে, উপযুক্ত হইয়াছে—উভয়পক্ষে। সে-ও খোঁপাটা একটু আঁটিয়া নিয়া রাঁধিতে বসিল। রাগে খোঁপাটা খুলিয়া গিয়াছিল। তার চোখে জল আসিতেছিল।

কৃষ্ণকান্তের উইল—

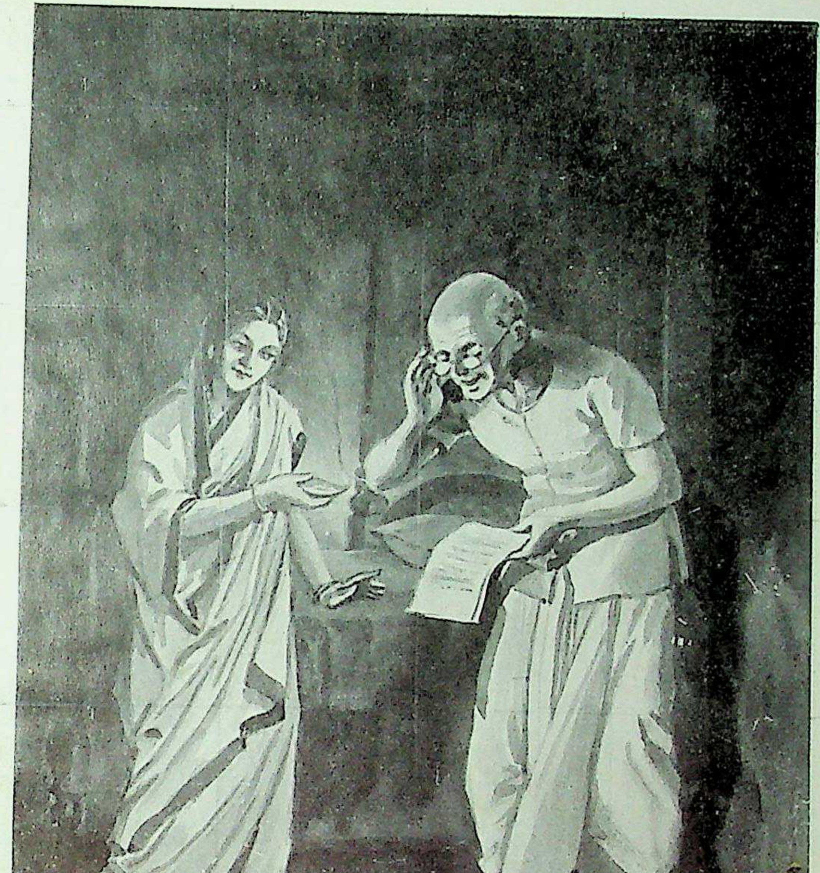

—"রোহিণী, আমি কি বুড়া হইয়া বিহ্বল হইয়াছি? এই দেখ, আমার দস্তখত।"

১৯ পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ দুঃখী লোক—দাসীচাকরাণীর বড় ধার ধারে না। সেটা সুবিধা কি কুবিধা, তাহা বলিতে পারি না। সুবিধা হউক, কুবিধা হউক, যাহার চাকরাণী নাই, তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল এবং ময়লা—এই চারিটি বস্তু নাই। চাকরাণী নামে দেবতা এই চারিটির সৃষ্টিকর্ত্তা। বিশেষ যাহার অনেকগুলি চাকরাণী, তাহার বাড়ীতে নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—নিত্য রাবণবধ। কোনো চাকরাণী ভীমরূপিণী, সর্ব্বদাই সম্মার্জ্জনীগদা হস্তে গৃহ-রণক্ষেত্রে ফিরিতেছেন; কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণতুল্য বীরগণকে ভৎ'সনা করিতেছেন; কেহ কুম্ভকর্ণরূপিণী—ছয় মাস করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন; নিদ্রান্তে সর্ব্বস্ব খাইতেছেন; কেহ সুগ্রীব, গ্রীবা হেলাইয়া কুম্ভকর্ণের বধের উদ্যোগ করিতেছেন। ইত্যাদি।

ব্রহ্মানন্দের সে-সকল আপদ-বালাই ছিল না, সুতরাং জল আনা, বাসন মাজাটা রোহিণীর ঘাড়ে পড়িয়াছিল। বৈকালে, অন্যান্য কাজ শেষ হইলে, রোহিণী জল আনিতে যাইত। যে-দিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তাহার পরদিন নিয়মিত সময়ে রোহিণী কলসী-কক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল। বাবুদের বড় একটা পুকুর আছে, নাম—বারুণী। জল তার বড় মিঠা। রোহিণী সেইখানে জল আনিতে যাইত। আজিও যাইতেছিল। রোহিণী একা জল আনিতে যায়; দল বাঁধিয়া যত হাল্‌কা মেয়ের সঙ্গে হাল্‌কা হাসিতে-হাসিতে, হাল্‌কা

কলসীতে হাল্‌কা জল আনিতে যাওয়া রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারী, চাল-চলনও ভারী। তবে রোহিণী—বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই।

বকুলের ডালে বসিয়া এক কোকিল ডাকিল। রোহিণী চারিদিক চাহিয়া দেখিল। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুন্‌গুনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—সরোবর-তীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে, ঝাঁকে-ঝাঁকে, লাখে-লাখে, স্তবকে-স্তবকে, শাখায়-শাখায়, পাতায়-পাতায়…যেখানে-সেখানে ফুল ফুটিয়াছে। বাতাসের সঙ্গে তাহার গন্ধ আসিতেছে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনের ছায়া-তলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড়-কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজি-নির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে ;—কুসুমিতবৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা-লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল! এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা।

কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল,—"কু-উ"। তখন রোহিণী সরোবর-সোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপানে অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল সেই কুসুমিতা-লতার অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন যে, রোহিণী আসিয়া ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে। গোবিন্দলালবাবু মনে-মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, এ-পাড়ায় কোনো মেয়েছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে। আমরা গোবিন্দলালের সিদ্ধান্তে তত ভরাভর করি না। রোহিণী কাঁদিতে লাগিল।

রোহিণী ভাবিতেছিল যে, কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীতে কোনো সুখভোগ করিতে পাইলাম না? কোন্ দোষে আমাকে শুষ্ক কাঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ-জীবনের সকল সুখে সুখী—মনে করো ঐ গোবিন্দলালবাবুর স্ত্রী, তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য? দূর হোক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই, কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি?

তা, আমরা তো বলিয়াছি, রোহিণী লোক ভালো নয়। দেখ, একটুতে কত হিংসা। রোহিণীর অনেক দোষ—তার কান্না দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি? করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই—পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভালো। দেবতার মেঘ, কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সংবরণ করে না।

শেষে সূর্য্য অস্ত গেলেন। ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল—শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখী সকল উড়িয়া

গিয়া গাছে বসিতে লাগিল। গোরু সকল গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল—অন্ধকারের উপর মৃদু আলো ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহার কলসী জলে ভাসিতেছে। তখন গোবিন্দলাল উদ্যান হইতে গৃহাভিমুখে চলিলেন—যাইবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া আছে।

এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া তাঁহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল যে, এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ ; আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি, তবে কেন করিব না ?

গোবিন্দলাল ধীরে-ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে গিয়া তাহার পার্শ্বে চম্পকনির্ম্মিত মূর্ত্তিবৎ সেই চম্পকবর্ণ চন্দ্র-কিরণে দাঁড়াইলেন। রোহিণী দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন—"রোহিণী! তুমি এতক্ষণ একা বসিয়া কাঁদিতেছ কেন ?"

রোহিণী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না। গোবিন্দলাল পুনরপি বলিলেন, "তোমার কিসের দুঃখ, আমায় কি বলিবে না ? যদি আমি কোনো উপকার করিতে পারি।"

যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল, গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিছু বলিল না—গঠিত পুত্তলীর মত সেই সরোবর-সোপানের শোভা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে আবার

বলিলেন, "তোমার যদি কোনো বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও। নিজে না বলিতে পারো, তবে আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা জানাইও।"

রোহিণী এবার কথা কহিল ; বলিল, "একদিন বলিব। আজ নহে। একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।"

গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইয়া গৃহাভিমুখে গেলেন। রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া, কলসী ধরিয়া তাহাতে জল পূরিল—পরে অন্তঃশূন্য কলসী পূর্ণতোয় হইলে, রোহিণী ঘাটে উঠিয়া ধীরে-ধীরে ঘরে যাইতে লাগিল। তখন 'চলৎ ছলৎ ঠনাক্! ঝিনিক্ ঠিনিকি ঠিন্!' বলিয়া কলসীতে আর রোহিণীর বালাতে কথোপকথন হইতে লাগিল। আর রোহিণীর মনও সেই কথোপকথনে আসিয়া যোগ দিল। রোহিণীর মন বলিল ঃ উইল চুরি-করা কাজটা—জল বলিল ঃ ছলাৎ।

রোহিণীর মন—কাজটা ভালো হয় নাই।

বালা বলিল ঃ ঠিন্ ঠিনা—না! তা তো না।

রোহিণীর মন—এখন উপায় ?

কলসী—ঠনক্ ঢনক্ ঢন্—উপায় আমি ;—দড়ি সহযোগে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রোহিণী সকাল-সকাল পাক-কার্য্য সমাধা করিয়া, ব্রহ্মানন্দকে ভোজন করাইয়া, আপনি অনাহারে শয়ন-গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়া শয়ন করিল। নিদ্রার জন্য নহে। চিন্তার জন্য।

তুমি দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতামত পরিত্যাগ করিয়া আমার কাছে একটা মোট কথা শুন। সুমতি নামে দেবকন্যা ও কুমতি নামে রাক্ষসী—এই দুইজন সর্ব্বদা মনুষ্যদের হৃদয়-ক্ষেত্রে বিচরণ করে এবং সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। আজ এই বিজন-শয়নাগারে রোহিণীকে লইয়া সেই দুইজনে ঘোর বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল।

যেমন দুইটা ব্যাঘ্রী মৃত গাভী লইয়া পরস্পরে যুদ্ধ করে, যেমন দুই শৃগালী মৃত নরদেহ লইয়া বিবাদ করে, ইহারা জীবন্ত মনুষ্য লইয়া সেইরূপ করে। আজ এই বিজন-শয়নাগারে রোহিণীকে লইয়া সেই দুইজনে সেইরূপ ঘোর বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল। সুমতি বলিতেছিল,—"এমন লোকেরও সর্ব্বনাশ করিতে আছে ?"

কুমতি। উইল তো হরলালকে দিই নাই। সর্ব্বনাশ কই করিয়াছি ?

সু। কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।

কু। বা! যখন কৃষ্ণকান্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, 'এ উইল তুমি কোথায় পাইলে, আর আমার দেরাজে একখানা জাল উইল-বা কোথা হইতে আসিল', তখন আমি কি বলিব ?

কি মজার কথা! কাকাতে-আমাতে দু'জনে থানায় যেতে বলো না কি?

সু। তবে সকল কথা কেন গোবিন্দলালের কাছে খুলিয়া বলিয়া, তাহার পায়ে কাঁদিয়া পড়ো না? সে দয়ালু, অবশ্য তোমাকে রক্ষা করিবে।

কু। সেই কথা! কিন্তু গোবিন্দলালকে অবশ্য এ-সকল কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে জানাইতে হইবে, নইলে উইলের বদল ভাঙিবে না। কৃষ্ণকান্ত যদি থানায় দেয়, তবে গোবিন্দলাল রাখিবে কি-প্রকারে? বরং আর-এক পরামর্শ আছে। এখন চুপ করিয়া থাকো—আগে কৃষ্ণকান্ত মরুক্, তারপর তোমার পরামর্শমতে গোবিন্দলালের কাছে গিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া পড়িব। তখন তাঁহাকে উইল দিব।

সু। তখন বৃথা হইবে। যে উইল কৃষ্ণকান্তের ঘরে পাওয়া যাইবে, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। গোবিন্দলাল সে উইল বাহির করিলে, জালের অপবাদগ্রস্ত হইতে পারে।

কু। তবে চুপ করিয়া থাকো—যা হইয়াছে, তা হইয়াছে।

সুতরাং সুমতি চুপ করিল—তাহার পরাজয় হইল। তারপর দুইজনে সন্ধি করিয়া সখ্যভাবে আর-এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সেই বাপীতীরবিরাজিত, চন্দ্রালোক-প্রতিভাসিত, চম্পকদামবিনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি আনিয়া, রোহিণীর মানস-চক্ষের অগ্রে ধরিল। রোহিণী দেখিতে লাগিল—দেখিতে-দেখিতে কাঁদিল। রোহিণী সে-রাত্রে ঘুমাইল না।

নবম পরিচ্ছেদ

সেই অবধি নিত্য কলসী-কক্ষে রোহিণী বারুণী-পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়, নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য সেই গোবিন্দলালকে পুষ্পকানন মধ্যে দেখিতে পায়, নিত্য সুমতি-কুমতিতে সন্ধি-বিগ্রহ উভয় ঘটনা হয়।

রোহিণী শেষ-সিদ্ধান্ত করিল, যে-প্রকারে প্রকৃত উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে জাল উইল লইয়া আসিবে।

নিশীথকালে রোহিণী প্রকৃত উইলখানি লইয়া সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। খিড়কীর দ্বার রুদ্ধ, সদর-ফটকে যথায় দ্বারবানেরা চারপাইয়ে উপবেশন করিয়া অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রে বসিয়াছিল, রোহিণী সেইখানে উপস্থিত হইল। দ্বারবানেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?" রোহিণী বলিল, "সখী।" সখী—বাটীর একজন যুবতী চাকরাণী, সুতরাং দ্বারবানেরা আর কিছু বলিল না। রোহিণী নির্ব্বিঘ্নে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্বপরিচিত পথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে গেল—পুরী সুরক্ষিত বলিয়া কৃষ্ণকান্তের শয়ন-গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইত না। প্রবেশকালে কান পাতিয়া রোহিণী শুনিল যে, অবাধে কৃষ্ণকান্তের নাসিকা-গর্জ্জন হইতেছে। তখন ধীরে-ধীরে বিনাশব্দে উইলচোর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দীপ নির্ব্বাপিত করিল। পরে পূর্ব্বমত চাবি সংগ্রহ করিল এবং পূর্ব্বমত অন্ধকারে দেরাজ খুলিল।

রোহিণী অতিশয় সাবধান···হস্ত অতি কোমলগতি। তথাপি চাবি ফিরাইতে খট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, কি শব্দ হইল। কোন সাড়া দিলেন না।

রোহিণীও দেখিল যে, নাসিকা-গর্জ্জনশব্দ বন্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের ঘুম ভাঙিয়াছে। রোহিণী স্থির হইয়া রহিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "কে ও?" কেহ কোনো উত্তর দিল না।

কৃষ্ণকান্ত হরিকে বার-কয় ডাকিলেন। রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে পলাইতে পারিত, কিন্তু তাহাতে গোবিন্দলালের প্রতীকার হয় না। রোহিণী মনে-মনে ভাবিল; "দুষ্কর্ম্মের জন্য সেদিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজ সৎকর্ম্মের জন্য তাহা করিতে পারিনা কেন? ধরা পড়ি পড়িব।"

রোহিণী পলাইল না।

কৃষ্ণকান্ত কয়বার হরিকে ডাকিলেন, তারপর উপাধানতল হইতে অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা গ্রহণপূর্ব্বক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন। দেখিলেন, গৃহমধ্যে দেরাজের কাছে—স্ত্রীলোক।

জ্বালিত শলাকাসংযোগে কৃষ্ণকান্ত বাতি জ্বালিলেন। স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কে?"

রোহিণী কৃষ্ণকান্তের কাছে গিয়া বলিল, "আমি রোহিণী।"

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "এত রাত্রে অন্ধকারে এখানে কি করিতেছিলে?"

রোহিণী বলিল, "চুরি করিতেছিলাম।"

কৃষ্ণ। রঙ্গ-রহস্য রাখো। কেন এ-অবস্থায় তোমাকে দেখিলাম,

বলো। তুমি চুরি করিতে আসিয়াছ, এ-কথা বিশ্বাস হয়না। কিন্তু চোরের অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতেছি।

রো। তবে আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা আপনার সম্মুখেই করি দেখুন। পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয় করিবেন। আমি ধরা পড়িয়াছি, পলাইব না।

এই বলিয়া রোহিণী দেরাজের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া, দেরাজ টানিয়া খুলিল। তাহার ভিতর হইতে জাল উইল বাহির করিয়া প্রকৃত উইল রাখিল। পরে জাল উইলখানি খণ্ড-খণ্ড করিয়া ফাড়িয়া ফেলিল।

"হাঁ, হাঁ, ও-কি ফাড়িলে? দেখি, দেখি," বলিয়া কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিলেন। কিন্তু রোহিণী সেই খণ্ড-খণ্ড বিচ্ছিন্ন উইল অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে লোচন আরক্ত করিয়া বলিলেন, "ও কি পোড়াইলি?"

রোহিণী। একখানি কৃত্রিম উইল।

কৃষ্ণকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন, "উইল! আমার উইল কোথায়?"

রো। আপনার উইল দেরাজের ভিতর আছে।

কৃষ্ণকান্ত তখন দেরাজ খুলিয়া দেখিলেন, একখানি উইল তন্মধ্যে আছে। সেখানি বাহির করিলেন, চশমা বাহির করিলেন। উইলখানি পড়িয়া জানিলেন, তাঁহার প্রকৃত উইল বটে। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পোড়াইলে কি?"

রো। একখানি জাল উইল।

কৃ। জাল উইল? জাল উইল কে করিল? তুমি তাহা কোথায় পাইলে?

রো। কে করিল তাহা বলিতে পারি না—উহা আমি এই দেরাজের মধ্যে পাইয়াছি।

কৃ। তুমি কি-প্রকারে সন্ধান জানিলে যে, দেরাজের ভিতরে কৃত্রিম উইল আছে ?

রো। আমি তাহা বলিতে পারিব না।

কৃষ্ণকান্ত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এ জাল উইল হরলালের তৈয়ারী। বোধহয়, তুমি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া, আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে ? তারপর ধরা পড়িবার ভয়ে জাল উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছ ?"

রো। তাহা নহে।

কৃ। তাহা নহে ? তবে কি ?

রো। আমি কিছু বলিব না। আমি আপনার ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমাকে যাহা করিতে হয়, করুন।

কৃ। তুমি মন্দ কর্ম্ম করিতে আসিয়াছিলে, সন্দেহ নাই, নইলে এ-প্রকারে চোরের মত আসিয়াছিলে কেন ? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিশে দিব না, কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আজ তুমি কয়েদ থাকো।

রোহিণী সে-রাত্রে আবদ্ধ রহিল।

———

দশম পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রের প্রভাতে শয্যাগৃহে মুক্ত বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল।

এই সময়ে সুপ্তোত্থিতা চাকরাণী-মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। শুনিয়া গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমর বাহিরে আসিলেন এবং শুনিলেন, রোহিণী গত-রাত্রে চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে এবং কাছারির গারদে কয়েদ আছে।

ভ্রমর যাহা শুনিলেন, তাহা গিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন। গোবিন্দলাল ভাবিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

ভ্র। ঘাড় নাড়িলে যে?

গো। আমার বিশ্বাস হইল না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয়?

ভোমরা বলিলেন, "না।"

গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বলো দেখি? লোকে তো বলিতেছে।

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় বলো দেখি?

গো। তা সময়ান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে বলো।

ভ্র। তুমি আগে বলো।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তুমি আগে।"

ভ্র। কেন আগে বলিব?

গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে।

ভ্র। সত্য বলিব ?

গো। সত্য বলো।

ভ্রমর বলি-বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরব রহিলেন।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রোহিণী যে নিরপরাধিনী, ভ্রমরের তাহা দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্তিত্বে যতদূর বিশ্বাস, ভ্রমর উহার নির্দ্দোষিতায় ততদূর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না—কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছেন যে, "সে নির্দ্দোষ, আমার এইরূপ বিশ্বাস।" গোবিন্দলালের বিশ্বাসই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই কালো এত ভালোবাসিতেন।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যাই।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল যাইতে উদ্যত হইলেন। ভ্রমর তাঁহার বসন ধরিলেন,—"কোথায় যাও ?"

গো। কোথা যাই বলো দেখি ?

ভ্র। রোহিণীকে বাঁচাইতে।

গো। তাই।

———

একাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্ত রায়ের সদর-কাছারীতে গিয়া দর্শন দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত প্রাতঃকালে কাছারীতে বসিয়াছিলেন, গদির উপর মস্‌নদ্ করিয়া বসিয়া, সোনার আলবোলায় অম্বুরী তামাক চড়াইয়া মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গের অনুকরণ করিতেছিলেন। একপার্শ্বে রাশি-রাশি দপ্তরে-বাঁধা চিঠা, খতিয়ান, দাখিলা, জমাওয়াশীল, থোকা, করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়—আর একপার্শ্বে নায়েব, কারকুন, মুহুরী, তহশীলদার, আমীন, পাইক, প্রজা। সম্মুখে অধোবদনা অবগুণ্ঠনবতী রোহিণী।

গোবিন্দলাল আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, জ্যেঠামহাশয় ?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, রোহিণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার কথার কি উত্তর করিলেন, তৎপ্রতি গোবিন্দলাল বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, সেই কটাক্ষের অর্থ কি ? শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন, এ কাতর-কটাক্ষের অর্থ—ভিক্ষা।

কি ভিক্ষা ? বিপদ হইতে উদ্ধার ! সেই বাপীতীরে সোপানোপরে দাঁড়াইয়া যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার এই সময়ে মনে পড়িল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার যদি কোনো বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও।" আজি তো রোহিণীর কষ্ট, বুঝি এই ইঙ্গিতে রোহিণী তাহা জানাইল।

গোবিন্দলাল মনে-মনে ভাবিলেন, "তোমার মঙ্গল সাধি, ইহা আমার ইচ্ছা ; কিন্তু তুমি যে-লোকের হাতে পড়িয়াছ, তোমার রক্ষা সহজ নহে।" এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে জ্যেষ্ঠতাতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, জ্যেঠামহাশয় ?"

কৃষ্ণকান্ত আনুপূর্বিক গতরাত্রের বৃত্তান্ত গোবিন্দলালকে শুনাইয়া শেষে বলিলেন, "এ সেই হরা পাজির কারসাজি। বোধ হইতেছে, রোহিণী তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া, আসল উইল চুরি করিবার জন্য আসিয়াছিল। তারপর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।"

গো। রোহিণী কি বলে ?

কৃ। ও আর বলিবে কি ? বলে, তা নয়।

গোবিন্দলাল রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা নয় তো তবে—কি রোহিণী ?"

রোহিণী মুখ না তুলিয়া বলিল, "আপনাদের হাতে পড়িয়াছি, যাহা হয় করুন। আমি আর কিছু বলিব না।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেখিলে বদ্‌জাতি ?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ইহার প্রতি কি হুকুম দিয়াছেন ? একে কি থানায় পাঠাইবেন ?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারি কি ? আমিই থানা, আমিই মেজেষ্টর, আমিই জজ। এই ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে জেলে দিয়া আমার কি পৌরুষ বাড়িবে ?"

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি করিবেন ?"

কৃ। ইহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, কুলার বাতাস দিয়া

গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আমার এলেকায় যেন আর না আসিতে পারে।

গোবিন্দলাল আবার রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলো, রোহিণী?"

রোহিণী বলিল, "ক্ষতি কি?"

গোবিন্দলাল বিস্মিত হইলেন। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন, "একটা নিবেদন আছে।"

কৃ। কি?

গো। ইহাকে একবার ছাড়িয়া দিন। আমি জামিন হইতেছি—বেলা দশটার সময় আনিয়া দিব।

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "বুঝি যা ভেবেছি, তাই! বাবাজীর কিছু গরজ দেখছি।"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "কোথায় যাইবে? কেন ছাড়িব?"

গো। আসল কথা কি, জানা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এত লোকের সাক্ষাতে আসল কথা এ প্রকাশ করিবে না। ইহাকে একবার অন্দরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিব।

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "ওর গোষ্ঠীর মুণ্ডু কর্‌বে। এ-কালের ছেলে-পুলে বড় বেহায়া হয়ে উঠেছে। রহ ছুঁচো। আমিও তোর উপর একচাল চালিব।" এই ভাবিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "বেশ তো।" বলিয়া কৃষ্ণকান্ত একজন নগদীকে বলিলেন, "ওরে! একে সঙ্গে ক'রে একজন চাকরাণী দিয়া মেজ বউ-মার কাছে পাঠিয়ে দে তো, দেখিস্, যেন পালায় না।"

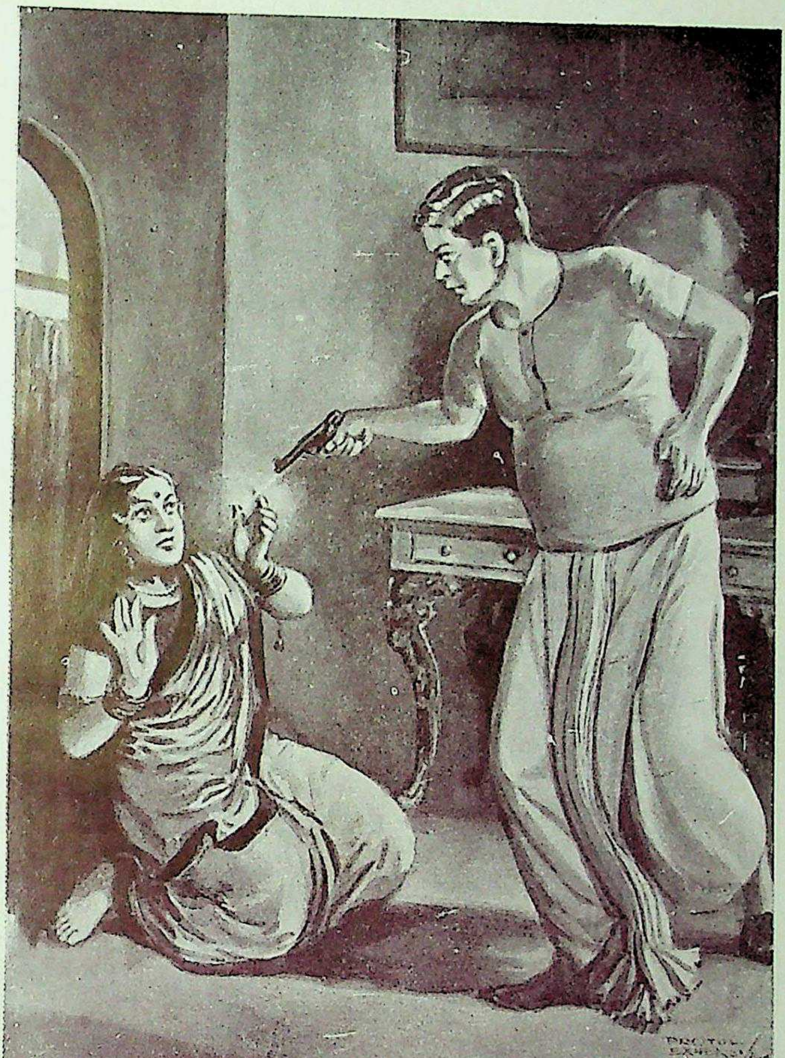

—গোবিন্দলাল পিস্তল বাহির করিয়া রোহিণীকে গুলি করিলেন।

১০৩ পৃষ্ঠা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন যে, ভ্রমর রোহিণীকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ভালো কথা বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এ দায় সম্বন্ধে ভালো কথা বলিলেও রোহিণীর কান্না আসে, এজন্য তাহাও বলিতে পারিতেছেন না। গোবিন্দলাল আসিলেন দেখিয়া, ভ্রমর যেন দায় হইতে উদ্ধার পাইলেন। শীঘ্রগতি দূরে গিয়া গোবিন্দলালকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলেন। গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে গেলেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোহিণী এখানে কেন ?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি গোপনে উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। তাহার পর উহার কপালে যা থাকে হবে।"

ভ্র। কি জিজ্ঞাসা করিবে ?

গো। উহার মনের কথা। আমাকে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয় আড়াল হইতে শুনিও।

ভ্রমর অপ্রতিভ হইয়া অন্দর-মহলে চলিয়া গেলেন।

এদিকে গোবিন্দলাল রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-বৃত্তান্ত আমাকে সবিশেষ বলিবে কি ?"

বলিবার জন্য রোহিণীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। বলিল, "কর্ত্তার কাছে সবিশেষ শুনিয়াছেন তো।"

গো। কর্ত্তা বলেন, তুমি জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে। তাই কি ?

রো। তা নয়।

গো। তবে কি ?

রো। বলিয়া কি হইবে ?

গো। তোমার ভালো হইতে পারে।

রো। আপনি বিশ্বাস করিলে তো ?

গো। বিশ্বাসযোগ্য কথা হইলে বিশ্বাস করিব না কেন ?

রোহিণী তারপর আসল-নকল উইলের সকল বৃত্তান্ত গোবিন্দলালকে বলিল। গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, যে-মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইল না—রাগও হইল না—সমুদ্রবৎ যে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল। বলিলেন, "রোহিণী, মৃত্যুই বোধহয় তোমার ভালো, কিন্তু মরণে কাজ নাই! সকলেই কাজ করিতে এ-সংসারে আসিয়াছি—আপনার-আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন ?"

গোবিন্দলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রোহিণী বলিল, "বলুন না ?"

গো। তোমাকে এ-দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

রো। কেন ?

গো। তুমি নিজে তো বলিতেছিলে, তুমি এ-দেশ ত্যাগ করিতে চাও।

রো। আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন ?

গো। তোমায়-আমায় আর দেখা-শুনা না হয়।

রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন। মনে-মনে বড়

অপ্রতিভ হইল—বড় সুখী হইল, তাহার সমস্ত যন্ত্রণা গেল। আবার তাহার দেশে থাকিতে বাসনা জন্মিল।

রোহিণী বলিল, "আমি এখনই যাইতে রাজী আছি, কিন্তু কোথায় যাইব ?"

গো। কলিকাতায়। সেখানে আমি আমার একজন বন্ধুকে পত্র দিতেছি। তিনি তোমাকে একখানি বাড়ী কিনিয়া দিবেন, তোমার টাকা লাগিবে না। তোমার সঙ্গে তোমার খুড়া যাইবেন। সেখানে আমার বন্ধু তোমার খুড়ার একটি চাকরি করিয়া দিবেন।

রোহিণী যাইতে রাজী হইল; বলিল, "কিন্তু আপনার জ্যেষ্ঠতাতকে সম্মত করিবে কে ? তিনি আমাকে ছাড়িবেন কেন ?"

গো। আমি অনুরোধ করিব।

রো। তাহা হইলে আমার কলঙ্কের উপর কলঙ্ক। আপনারও কিছু কলঙ্ক।

গো। সত্য। তোমার জন্য কর্ত্তার কাছে, ভ্রমর অনুরোধ করিবে। তুমি এখন ভ্রমরের অনুসন্ধানে যাও। ডাকিলে যেন পাই।

রোহিণী প্রস্থান করিল।

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর শ্বশুরকে কোনপ্রকার অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অগত্যা কৃষ্ণকান্তের কাছে গোবিন্দলাল নিজেই গেলেন।

কৃষ্ণকান্ত তখন আহারান্তে পালঙ্কে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় আলবোলার নল হাতে করিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতেছিলেন, এমন সময় গোবিন্দলাল তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "জ্যেঠামহাশয়!"

কৃষ্ণকান্ত শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, গোবিন্দলাল?" গোবিন্দলালকে বুড়া বড় ভালোবাসিতেন।

গোবিন্দলালও কিছু অপ্রতিভ হইলেন—বলিলেন, "আপনি নিদ্রা যান—আমি এমন কিছু কাজে আসি নাই।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত শক্ত বুড়া—বলিলেন, "আমার ঘুম হইয়াছে, আর ঘুমাইব না।"

গোবিন্দলাল একটু গোলে পড়িলেন। রোহিণীর কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে বলিতে প্রাতে তাঁহার কোনো লজ্জা করে নাই, এখন একটু লজ্জা করিতে লাগিল। কথা বলি-বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না। রোহিণীর সঙ্গে বারুণী-পুকুরের কথা হইয়াছিল বলিয়া কি এখন লজ্জা?

বুড়া রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। গোবিন্দলাল কোনো কথা পাড়িতেছে না দেখিয়া আপনি জমিদারীর কথা পাড়িলেন—জমিদারীর কথার পর সাংসারিক কথা, সাংসারিক কথার পর মোকদ্দমার কথা, তথাপি, রোহিণীর দিক্ দিয়াও গেল না।

গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা কিছুতেই পাড়িতে পারিলেন না। কৃষ্ণকান্ত মনে-মনে ভারি হাসি হাসিতে লাগিলেন। বুড়া বড় দুষ্ট।

অগত্যা গোবিন্দলাল ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন কৃষ্ণকান্ত প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোহিণী কিছু স্বীকার করিয়াছে?"

তখন গোবিন্দলাল পথ পাইয়া, যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, সংক্ষেপে বলিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "এখন তাহার প্রতি কিরূপ করা তোমার অভিপ্রায়?"

গোবিন্দলাল লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনার যে অভিপ্রায়, আমাদিগেরও সেই অভিপ্রায়।"

কৃষ্ণকান্ত মনে-মনে হাসিয়া, মুখে কিছুমাত্র হাসির লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, "আমি উহার কথায় বিশ্বাস করি না। উহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া দেশের বাহির করিয়া দাও—কি বলো?"

গোবিন্দলাল চুপ করিয়া রহিলেন। তখন দুষ্ট বুড়া বলিলেন,—"আর, তোমরা যদি এমনই বিবেচনা করো যে, উহার দোষ নাই—তবে ছাড়িয়া দাও।"

গোবিন্দলাল তখন নিশ্বাস ছাড়িয়া, বুড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রোহিণী গোবিন্দলালের অনুমতিক্রমে খুড়ার সঙ্গে বিদেশ যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আসিল। খুড়াকে কিছু না বলিয়া ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া রোহিণী কাঁদিতে বসিল।

তারপর কালামুখী রোহিণী উঠিয়া দ্বার খুলিয়া আবার গোবিন্দলালের কাছে চলিল। রোহিণী কাঁদিতে-কাঁদিতে গোবিন্দলালের কাছে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল।

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল ত ?"

রো। না।

গো। সে কি ? এইমাত্র আমার কাছে স্বীকার করিয়াছিলে ?

রো। যাইতে পারিব না।

গো। বলিতে পারি না। জোর করিবার আমার কোনোই অধিকার নাই। কিন্তু, গেলে ভালো হইত।

রো। কিসে ভালো হইত ?

গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন। স্পষ্ট করিয়া কোনো কথা বলিবার তিনি কে ?

রোহিণী তখন চক্ষের জল লুকাইয়া মুছিতে-মুছিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। গোবিন্দলাল নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন সেখানে ভ্রমর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "ভাবচো কি ?"

গো। বলিলে তুমি রাগ করিবে।

ভ্র। করি করবো, বলো না।

গো। রোহিণীকে ভাবছিলাম। আমি রোহিণীকে ভালোবাসি না। রোহিণী আমায় ভালোবাসে।

ভ্র। পোড়ারমুখী, মরুক্ !

এই বলিয়া ভোমরা "ক্ষীরি! ক্ষীরি!" করিয়া একজন চাকরাণীকে ডাকিলেন। তখন 'ক্ষীরি' আসিয়া দাঁড়াইল।

ভোমরা বলিলেন, "আমার নাম করিয়া রোহিণীকে বলিয়া আয় যে, তিনি বলিলেন, 'তুমি মরো'।"

ক্ষীরি বলিল, "এই ?—যাই।"

গমনকালে ভোমরা বলিয়া দিলেন, "কি বলে, আমায় বলিয়া যাস।"

"আচ্ছা।" বলিয়া ক্ষীরোদা চলিয়া গেল। অল্পকাল মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বলিয়া আসিয়াছি।"

ভো। সে কি বলিল ?

ক্ষীরি। সে বলিল, উপায় বলিয়া দিতে বলিও।

ভো। তবে আবার যা, বলিয়া আয় যে, বারুণী-পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা—কলসী গলায় দিয়ে—বুঝেছিস ?

ক্ষীরি আবার গেল, আবার আসিল এবং বলিল, "রোহিণী বলিয়াছে, 'আচ্ছা'।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ছি ভোমরা !"

ভ্র। ভাবিও না। সে মরিবে না।

———

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দৈনিক কার্য্য সমস্ত সমাপ্ত করিয়া প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গোবিন্দলাল দিনান্তে বারুণীর তীরবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যানভ্রমণ একটি প্রধান সুখ। সকল বৃক্ষের তলায় দুই-চারিবার বেড়াইতেন। কিন্তু আমরা সকল বৃক্ষের কথা এখন বলিব না। বারুণীর কূলে উদ্যানমধ্যে এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা ছিল, বেদিকা-মধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তর-ক্ষোদিত স্ত্রী-প্রতিমূর্ত্তি। তাহার চারিপার্শ্বে বেদিকার উপরে উজ্জ্বলবর্ণ-রঞ্জিত মৃন্ময়-আধারে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সপুষ্প বৃক্ষ—জিরানিয়ম, ভাবিনা, ইউফরিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ—নীচে সেই বেদিকা বেষ্টন করিয়া কামিনী, যূথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন আমোদিত করিতেছে—তাহারই পরে বহুবিধ উজ্জ্বল, নীল, পীত, রক্ত, শ্বেত, নানাবর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্জনকারী পাতার গাছের শ্রেণী। সেইখানে গোবিন্দলাল বসিতে ভালোবাসিতেন। সেইখানে আজ গোবিন্দলাল সন্ধ্যাকালে বসিয়া দর্পণানুরূপ বারুণীর জলশোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে-দেখিতে দেখিলেন, সেই পুষ্করিণীর প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান-পরম্পরায় রোহিণী কলসী-কক্ষে অবরোহণ করিতেছে। সব না হইলে চলে, জল না হইলে চলে না। এ দুঃখের দিনেও রোহিণী জল লইতে আসিয়াছে। রোহিণী জলে নামিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিবার সম্ভাবনা—দৃষ্টিপথে তাঁহার থাকা অকর্ত্তব্য বলিয়া গোবিন্দলাল সে-স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ গোবিন্দলাল এ-দিক্ ও-দিক্ বেড়াইলেন। শেষে মনে করিলেন, এতক্ষণ রোহিণী উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখিলেন, রোহিণী বা কোনো স্ত্রীলোক বা পুরুষ কোথাও কেহ নাই। কিন্তু জলোপরে একটি কলসী ভাসিতেছে।

কার কলসী? হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হইল—কেহ জল লইতে আসিয়া ডুবিয়া যায় নাই তো? রোহিণী এইমাত্র জল লইতে আসিয়াছিল—তখন অকস্মাৎ পূর্ব্বাহ্নের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল, ভ্রমর রোহিণীকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, বারুণী-পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা—কলসী গলায় বেঁধে। মনে পড়িল, রোহিণী প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ পুষ্করিণীর ঘাটে আসিলেন, সর্ব্বশেষ সোপানে দাঁড়াইয়া পুষ্করিণীর সর্ব্বত্র দেখিতে লাগিলেন। জল কাচতুল্য স্বচ্ছ। ঘাটের নীচে জলতলস্থ ভূমি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। দেখিলেন, স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হেমপ্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।

———

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া ডুব দিয়া রোহিণীকে উঠাইয়া সোপান-উপরি শায়িতা করিলেন। দেখিলেন, রোহিণী জীবিতা আছে কি না সন্দেহ ; সে সংজ্ঞাহীনা, নিশ্বাস-প্রশ্বাসরহিতা।

উদ্যান হইতে গোবিন্দলাল একজন মালীকে ডাকিলেন। মালীর সাহায্যে রোহিণীকে বহন করিয়া উদ্যানস্থ প্রমোদগৃহে শুশ্রূষার জন্য লইয়া গেলেন। জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষ গোবিন্দলালের গৃহে প্রবেশ করিল। ভ্রমর ভিন্ন আর কোনো স্ত্রীলোক কখনও সে উদ্যানগৃহে প্রবেশ করে নাই।

বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত সে মৃত নারীদেহ, পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশাল-দীর্ঘ-বিলম্বিত ঘোর-কৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘ যেন জলবৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত, কিন্তু সেই মুদ্রিত পক্ষ্মের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণ-শোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট—স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয়হীন কোন অব্যক্তভাববিশিষ্ট—গণ্ড এখনও উজ্জ্বল! গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন, "মরি-মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন? দিয়াছিলেন তো সুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?"

যদি রোহিণীর জীবন থাকে, রোহিণীকে বাঁচাইতে হইবে। জলমগ্নকে কি করিয়া বাঁচাইতে হয়, গোবিন্দলাল তাহা জানিতেন। উদরস্থ জল সহজেই বাহির করানো যায়। দুই-চারিবার রোহিণীকে উঠাইয়া-বসাইয়া, পাশ ফিরাইয়া ঘুরাইয়া জল উদ্‌গিরণ করাইলেন। কিন্তু তাহাতে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিল না।

গোবিন্দলাল জানিতেন, মুমূর্ষুর বাহুদ্বয় ধরিয়া ঊর্দ্ধোত্তোলন করিলে অন্তরস্থ বায়ুকোষ স্ফীত হয়, সেই সময় উত্তোলিত বাহুদ্বয় নামাইতে হয়। নামাইলে বায়ুকোষ সঙ্কুচিত হয়। এইরূপ পুনঃপুনঃ করিতে-করিতে বায়ুকোষের কার্য্য স্বতঃ পুনরাগত হইতে থাকে। এইরূপ করাইতে-করাইতে সহজ নিশ্বাস-প্রশ্বাস আপনি উপস্থিত হয়। রোহিণীকে তাই করিতে হইবে।

তারপর দুই-তিন ঘণ্টা এইরূপ করিবার পরে রোহিণীর নিশ্বাস বহিল। রোহিণী বাঁচিল।

সেই সময়ে ভ্রমর একটা লাঠি লইয়া একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিলেন। বিড়াল মারিতে লাঠি—বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রোহিণীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে লাগিলে গোবিন্দলাল তাহাকে ঔষধ পান করাইলেন। রোহিণী গোবিন্দলাল-হস্ত প্রদত্ত মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করিয়া মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল—আর-এক দিকে তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী কথা শ্রবণপথে পান করিয়া মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল। প্রথমে নিশ্বাস, পরে চৈতন্য, পরে দৃষ্টি, পরে স্মৃতি, শেষে বাক্য স্ফুরিত হইতে লাগিল। ঔষধ বলকারক—ক্রমে রোহিণীর বলসঞ্চার হইতে লাগিল। রোহিণী চাহিয়া দেখিল, সজ্জিত রম্য গৃহমধ্যে মন্দ-মন্দ শীতল পবন বাতায়নপথে পরিভ্রমণ করিতেছে। রোহিণী বলিল, "আমি মরিয়াছিলাম, আমাকে কে বাঁচাইল ?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যেই বাঁচাক্, তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ, এই যথেষ্ট।"

রোহিণী বলিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন ? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে, মরণেও আপনি প্রতিবাদী ?"

গো। তুমি মরিবে কেন ?

রো। মরিবারও কি আমার অধিকার নাই ?

গো। পাপে কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা পাপ।

রো। আমি পাপপুণ্য জানি না—আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি পাপপুণ্য মানি না—কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড ? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই-বা ইহার বেশী কি হইবে ? আমি মরিব। এবার নাহয় তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম

বলিয়া তুমি রক্ষা করিয়াছ, ফিরেবার যাহাতে তোমার চক্ষে না পড়ি সে যত্ন করিব।

গোবিন্দলাল বড় কাতর হইলেন, বলিলেন, "তুমি কেন মরিবে?"

রো। চিরকাল ধরিয়া দণ্ডে-দণ্ডে, পলে-পলে রাত্রিদিন মরা অপেক্ষা একবারে মরা ভালো।

গো। কিসের এত যন্ত্রণা?

রো। রাত্রিদিন দারুণ তৃষ্ণা, সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে-জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।

গোবিন্দলাল তখন বলিলেন, "আর এ-সব কথায় কাজ নাই, চলো তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।"

রোহিণী বলিল, "না, আমি একাই যাইব।"

গোবিন্দলাল বুঝিলেন, আপত্তিটা কি। গোবিন্দলাল আর কিছুই বলিলেন না। রোহিণী একাই গেল।

তখন গোবিন্দলাল সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা করো! তুমি বল না দিলে কাহার বলে আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইব? আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্ম-জয় করিব।"

———

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজি এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে ছিলে কেন?"

গো। কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আর কখনো কি থাকি না?

ভ্র। থাকো—কিন্তু আজি তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার কথার আওয়াজে বোধ হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে।

গো। কি হইয়াছে?

ভ্র। কি হইয়াছে তাহা তুমি না বলিলে আমি কি-প্রকারে বলিব? আমি কি সেখানে ছিলাম?

গো। কেন, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পারো না?

ভ্র। তামাসা রাখো। কথাটা ভালো কথা নহে—সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পারিতেছি। আমায় বলো, আমার প্রাণ বড় কাতর হইয়াছে। বলিতে-বলিতে ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের চক্ষের জল মুছাইয়া, আদর করিয়া বলিলেন, "আর-একদিন বলিব ভ্রমর—আজ নহে।"

ভ্র। আজ নহে কেন?

গো। তুমি এখন বালিকা, সে-কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।

ভ্র। কালি কি বুড়া হইব?

গো। কালও বলিব না, দুই বৎসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা করিও না, ভ্রমর!

ভ্রমর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বলিলেন, "তবে তাই—দুই বৎসর পরেই বলিও। আমার শুনিবার বড়ই সাধ ছিল—কিন্তু তুমি যদি বলিলে না—তবে আমি শুনিব কি-প্রকারে? আমার বড় মন কেমন-কেমন করিতেছে।"

কেমন একটা বড় ভারী দুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল। যেমন বসন্তের আকাশ—বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল—কোথাও কিছু নাই; অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলে—ভোমরার বোধ হইল, যেন তাঁর বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া সহসা চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলিল। ভ্রমরের চক্ষে জল আসিতে লাগিল। ভ্রমর মনে করিলেন, "আমি অকারণে কাঁদিতেছি—বড় দুষ্ট হইয়াছি—আমার স্বামী রাগ করিবেন।"

অতএব ভ্রমর কাঁদিতে-কাঁদিতে বাহির হইয়া গিয়া, কোণে বসিয়া পা ছড়াইয়া অন্নদামঙ্গল পড়িতে বসিলেন। কি মাথা-মুণ্ড পড়িলেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু বুকের ভিতর হইতে সে কালো মেঘখানা কিছুতেই নামিল না।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলালবাবু জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গে বৈষয়িক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। কথোপকথনচ্ছলে কোন্ জমিদারীর কিরূপ অবস্থা তাহা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের বিষয়-অনুরাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, সকল মহালগুলি একবার দেখিয়া আসি।"

কৃষ্ণকান্ত আহ্লাদিত হইলেন; বলিলেন,—"আমার তাহাতে বড় আহ্লাদ। আপাততঃ বন্দরখালিতে কিছু গোলমাল উপস্থিত। তোমার যদি ইচ্ছা থাকে তবে বলো, আমি তোমাকে সেখানে পাঠাইবার উদ্যোগ করি।"

গোবিন্দলাল সম্মত হইলেন। তিনি এইজন্যই কৃষ্ণকান্তের কাছে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মন রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাহা বুঝিয়া মনে-মনে শপথ করিয়া স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না। তিনি মনে-মনে স্থির করিলেন যে,—বিষয়কর্ম্মে মনোভিনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব—স্থানান্তরে গেলে নিশ্চিত ভুলিতে পারিব। বন্দরখালির কথা শুনিয়া আগ্রহসহকারে তথায় গমনে সম্মত হইলেন।

ভ্রমর শুনিলেন, মেজবাবু দেহাতে যাইবেন। ভ্রমর ধরিলেন, আমিও যাইব। কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না। গোবিন্দলাল দশ দিনের পথ বন্দরখালি যাত্রা করিলেন।

———

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

কিছু ভালো লাগে না—ভ্রমর একা। ভ্রমর শয্যা তুলিয়া ফেলিলেন—বড় গরম। খাটের পাখা খুলিয়া ফেলিলেন—বাতাস বড় গরম; চাকরাণীদিগকে ফুল আনিতে বারণ করিলেন—ফুলে বড় পোকা। তাস খেলা বন্ধ করিলেন—সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—তাস খেলিলে শাশুড়ী রাগ করেন। সূচ, সূতা, উল, পেটার্ণ, সব একে-একে পাড়ার মেয়েদের বিলাইয়া দিলেন—জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে, বড় চোখ জ্বালা করে। বস্ত্র মলিন কেন কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, ধোপাকে গালি পাড়েন, অথচ ধৌত-বস্ত্রে গৃহ পরিপূর্ণ। মাথার চুলের সঙ্গে চিরুণীর সম্পর্ক রহিত হইয়া আসিয়াছিল—উলুবনের খড়ের মত চুল বাতাসে দুলিত,—জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রমর হাসিয়া চুলগুলি হাত দিয়া টানিয়া খোঁপায় গুঁজিতেন, ঐ পর্য্যন্ত। আহারাদির সময় ভ্রমর নিত্য বাহানা করিতে আরম্ভ করিলেন, "আমি খাইব না, আমার জ্বর হইয়াছে।"

শাশুড়ী কবিরাজ দেখাইয়া, পাচন ও বড়ীর ব্যবস্থা করিয়া ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন যে, বৌমাকে ঔষধগুলি খাওয়াইবি। ক্ষীরির হাত হইতে বড়ী-পাচন কাড়িয়া লইয়া বৌমা জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিলেন। ক্রমে-ক্রমে এতটা বাড়াবাড়ি ক্ষীরি-চাকরাণীর অসহ্য হইয়া উঠিল; সে বলিল, "ভালো, বৌ-ঠাকুরাণী, কার জন্য তুমি অমন করো? যাঁর জন্য তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলে, তিনি কি তোমার কথা একদিনের জন্যও ভাবেন?"

ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিলেন।

ক্ষীরোদা মধ্যে-মধ্যে ভ্রমরের কাছে চড়টা-চাপড়টা খাইত, কখনও রাগ করিত না, কিন্তু আজি একটু রাগিল; বলিল, "তা ঠাকরুণ্, আমাদের মারিলে-ধরিলে কি হইবে—তোমারই জন্য আমরা বলি। তোমাদের কথা লইয়া লোকে একটা হৈ-হৈ করে, আমরা তা সইতে পারি না। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তুমি পাঁচীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করো।"

ভ্রমর ক্রোধে দুঃখে কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, "তোর জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তুই করগে, আমি কি তোদের মত ছুঁচো-পাজি যে, আমার স্বামীর কথা পাঁচী-চাঁড়ালনীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা।"

তখন সকালবেলা। উত্তম-মধ্যম ভোজন করিয়া ক্ষীরি রাগে গর্-গর্ করিতে-করিতে চলিয়া গেল। এ-দিকে ভ্রমর ঊর্দ্ধমুখে, সজল-নয়নে, যুক্ত-করে মনে-মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে গুরো! শিক্ষক! ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি কি সেদিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে?"

তার মনের ভিতর যে মন, হৃদয়ের যে-লুক্কায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না—যেখানে আত্ম-প্রতারণা নাই, সেখান পর্য্যন্ত দেখিলেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। ভ্রমর কেবল একবার মনে-মনে ভাবিলেন যে, তিনি অবিশ্বাসী হইলেই-বা এমন দুঃখ কি? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে।

একবিংশত্তিতম পরিচ্ছেদ

ক্রমে ভ্রমরের কাছে সংবাদ আসিতে লাগিল, স্বামী রোহিণীর প্রতি আসক্ত।

গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিলেন। তাঁহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত। কালো-কুৎসিতের এত সুখ, অনন্ত ঐশ্বর্য্য—দেবদুর্ল্লভ স্বামী—লোকে কলঙ্কশূন্য যশ—অপরাজিতাতে পদ্মের আদর? আবার তার উপর মল্লিকার সৌরভ? গ্রামের লোকের এত সহিত না; তাই পালে-পালে, দলে-দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া, কেহ কবরী বাঁধিয়া, কেহ কবরী বাঁধিতে-বাঁধিতে, কেহ এলোচুলে সংবাদ দিতে আসিলেন, "ভ্রমর, তোমার সুখ গিয়াছে।" কাহারও মনে হইল না যে, ভ্রমর নিতান্ত দোষশূন্যা দুঃখিনী বালিকা।

ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মনে-মনে বলিলেন, "হে সন্দেহভঞ্জন! হে প্রিয়তম! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস। আজ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে সকলে বলিবে কেন? তুমি এখানে নাই, আজ আমার সন্দেহভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহভঞ্জন হইল না—তবে মরি না কেন? এ সন্দেহ লইয়া কি বাঁচা যায়? আমি মরি না কেন? ফিরিয়া আসিয়া তুমি আমায় গালি দিও না যে, ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।"

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এখন—ভ্রমরেরও যে জ্বালা, রোহিণীরও সেই জ্বালা; কথা যদি রটিল, রোহিণীর কানেই-বা না উঠিবে কেন? রোহিণী শুনিল, গ্রামে রাষ্ট্র যে, গোবিন্দলাল তাহার গোলাম, সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। কথা যে কোথা হইতে রটিল, তাহা রোহিণী শুনে নাই। কে রটাইল, তাহার কোনো তদন্ত করে নাই; একেবারে সিদ্ধান্ত করিল যে, তবে ভ্রমরই রটাইয়াছে, নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার? রোহিণী ভাবিল—ভ্রমর আমাকে জ্বালাইল। সেদিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ। এ-দেশে আর থাকিব না, কিন্তু যাইবার আগে ভ্রমরকে হাড়ে-হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।

রোহিণী না পারে, এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্ব্ব-পরিচয়ে জানা গিয়াছে। রোহিণী কোন প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানি বারাণসী ও এক স্যুট্ গিল্টির গহনা চাহিয়া আনিল। সন্ধ্যা হইলে সেইগুলি পুঁটুলি বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া রায়দিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যথায় ভ্রমর একাকিনী মৃৎশয্যায় শয়ন করিয়া এক-একবার কাঁদিতেছেন, এক-একবার চক্ষের জল মুছিয়া কড়িপানে চাহিয়া ভাবিতেছেন, তথায় রোহিণী গিয়া পুঁটুলি রাখিয়া উপবেশন করিল। ভ্রমর বিস্মিত হইলেন! রোহিণীকে দেখিয়া, বিষের জ্বালায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সহিতে না পারিয়া ভ্রমর বলিলেন, "তুমি সেদিন রাত্রে ঠাকুরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিলে; আজ রাত্রে আমার ঘরে সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছ নাকি?"

রোহিণী মনে-মনে বলিল, "তোমার মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি।" প্রকাশ্যে বলিল, "এখন আমার চুরির প্রয়োজন নাই; আমি আর টাকার কাঙাল নহি। মেজবাবুর অনুগ্রহে আমার আর খাইবার-পরিবার দুঃখ নাই। তবে লোকে যতটা বলে, ততটা নহে।"

ভ্রমর বলিলেন, "তুমি এখান হইতে দূর হও।"

রোহিণী সে-কথা কানে না তুলিয়া বলিতে লাগিল, "লোকে যতটা বলে, ততটা নহে। লোকে বলে, আমি সাত হাজার টাকার গহনা পাইয়াছি। মোটে তিন হাজার টাকার গহনা আর এই শাড়ীখানি পাইয়াছি। তাই তোমায় দেখাইতে আসিয়াছি। সাত হাজার টাকা লোকে বলে কেন?"

এই বলিয়া রোহিণী পুঁটুলি খুলিয়া বারাণসী শাড়ী ও গিল্‌টির গহনাগুলি ভ্রমরকে দেখাইল। ভ্রমর লাথি মারিয়া অলঙ্কারগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া দিলেন। রোহিণী বলিল, "সোনায় পা দিতে নাই।" এই বলিয়া রোহিণী নিঃশব্দে গিল্‌টির অলঙ্কারগুলি কুড়াইয়া আবার পুঁটুলি বাঁধিল, পুঁটুলি বাঁধিয়া নিঃশব্দে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমাদের বড় দুঃখ রহিল। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু রোহিণীকে একটি কিলও মারিলেন না।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

সে-রাত্রি প্রভাত না-হইতেই ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিলেন। লেখাপড়া গোবিন্দলাল শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমর লেখাপড়ায় তত মজবুত হইয়া উঠেন নাই। ফুলটি, পুতুলটি, পাখাটি, স্বামীটিতে ভ্রমরের মন, লেখাপড়া বা গৃহকর্ম্মে তত নহে। কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলে, একবার লিখিতেন, একবার কাটিতেন, একবার কাগজ বদ্‌লাইয়া আবার মুছিতেন, আবার কাটিতেন। শেষ ফেলিয়া রাখিতেন। কিন্তু আজ সে-সকল কিছুই হইল না। ভ্রমর লিখিলেন ঃ

"সেদিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরী হইয়াছিল তাহা আমাকে ভাঙিয়া বলিলে না। দুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছ, তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে।

"তুমি মনে জানো, বোধ হয় তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা। —তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম; কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তিযোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া-কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব।"

গোবিন্দলাল যথাকালে সেই পত্র পাইলেন। তাঁহার মাথায়

বজ্রাঘাত হইল। কেবল হস্তাক্ষরে আর বর্ণাশুদ্ধির প্রণালী দেখিয়াই তিনি বিশ্বাস করিলেন যে, এ ভ্রমরের লেখা। তথাপি মনে অনেকবার সন্দেহ করিলেন—ভ্রমর তাঁহাকে এমন পত্র লিখিতে পারে, তাহা তিনি কখনও বিশ্বাস করেন নাই। আবার ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে লিখিয়াছে, "ভাই হে, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয়—উলুখড়ের প্রাণ যায়। তোমার উপর বৌ-মা সকল দৌরাত্ম্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা দুঃখী প্রাণী, আমাদিগের উপর এ দৌরাত্ম্য কেন? তিনি রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও কত কদর্য্য কথা রটিয়াছে, তাহা তোমাকে লিখিতে লজ্জা করে,—যাহা হউক, তোমার কাছে আমার নালিশ—তুমি ইহার বিহিত করিবে। নইলে আমি এখানকার বাস উঠাইব।"

গোবিন্দলাল আবার বিস্মিত হইলেন—ভ্রমর রটাইয়াছে? মর্ম্ম কিছুই না বুঝিতে পারিয়া গোবিন্দলাল সেইদিন আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, "এখানকার জলবায়ু আমার সহ্য হইতেছে না, আমি কালই বাটী যাইব। নৌকা প্রস্তুত করো।"

পরদিন নৌকারোহণে, বিষণ্ন মনে গোবিন্দলাল গৃহে যাত্রা করিলেন।

———

চতুর্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

যাহাকে ভালোবাসো, তাহাকে নয়নের আড় করিও না। অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে। যাহাকে বিদায় দিবার সময় কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না—কয় বৎসর পরে তাহার সহিত আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছ—"ভালো আছো তো ?"

একবার চক্ষের বাহির হইলেই, যা ছিল, তা আর হয় না ; যা যায়, তা আর আসে না ; যা ভাঙে, তা আর গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ ?

গোবিন্দলাল স্বদেশ যাত্রা করিলে, নায়েব কৃষ্ণকান্তের কাছে চিঠি পাঠাইল যে, মধ্যম বাবু অদ্য প্রাতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সে-পত্র ডাকে আসিল। ভ্রমর শুনিলেন, স্বামী আসিতেছেন। ভ্রমর অমনি মাতাকে লিখিলেন যে, "আমার বড় পীড়া হইয়াছে। তোমরা যদি একবার লইয়া যাও, তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি। বিলম্ব করিও না, পীড়া বৃদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে না। পারো যদি—কাল লোক পাঠাইও। এখানে পীড়ার কথা বলিও না।" এই পত্র লিখিয়া গোপনে ক্ষীরি-চাকরাণীর দ্বারা লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর তাহা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

যদি মা না হইয়া আর-কেহ হইত, তবে ভ্রমরের পত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিত যে, ইহার ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে।

কিন্তু মা—সন্তানের পীড়ার কথা শুনিয়া একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশে ভ্রমরের শাশুড়ীকে এক লক্ষ গালি দিয়া,

কাঁদিয়া-কাটিয়া ঠিক করিলেন যে, আগামী কল্য বেহারা-পাল্কী লইয়া চাকর-চাকরাণী ভ্রমরকে আনিতে যাইবে। ভ্রমরের পিতা কৃষ্ণকান্তকে লিখিলেন যে, "ভ্রমরের মাতা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছেন, ভ্রমরকে একবার দেখিতে পাঠাইয়া দিবেন।"

কৃষ্ণকান্ত বড় বিপদে পড়িলেন। এ-দিকে গোবিন্দলাল আসিতেছে, এ-সময়ে ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠানো অকর্ত্তব্য। ওদিকে ভ্রমরের মাতা পীড়িতা, না পাঠাইলেও নয়। সাত-পাঁচ ভাবিয়া চারি দিনের কড়ারে ভ্রমরকে পাঠাইয়া দিলেন।

চারি দিনের দিন গোবিন্দলাল আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলেন যে, ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে, আজি তাহাকে আনিতে পাল্কী যাইবে। গোবিন্দলাল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে-মনে বড় অভিমান হইল। মনে-মনে ভাবিলেন, "এত অবিশ্বাস ? না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল ? আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না।"

এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলেন। কেন নিষেধ করিলেন, তাহা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সম্মতি পাইয়া কৃষ্ণকান্ত বধূ আনিবার জন্য আর কোনো উদ্যোগ করিলেন না।

পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এইরূপে দুই-চারি দিন গেল। ভ্রমরকে কেহ আনিল না। ভ্রমরও আসিলেন না। গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরের বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব।

শেষ দুর্ব্বুদ্ধি গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়—রোহিণীর চিন্তা।

গোবিন্দলাল বারুণীতটে পুষ্পবৃক্ষ-পরিবেষ্টিত মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করিয়া সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন। বর্ষাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাদল হইয়াছে—বৃষ্টি কখনও-কখনও জোরে আসিতেছে—কখনও মৃদু হইতেছে। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়া নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। প্রায়াগতা যামিনীর অন্ধকার, তাহার উপর বাদলের অন্ধকার, বারুণীর ঘাট স্পষ্ট দেখা যায় না। গোবিন্দলাল অস্পষ্ট-রূপে দেখিলেন যে, একজন স্ত্রীলোক নামিতেছে। রোহিণীর সেই সোপানাবতরণ গোবিন্দলালের মনে হইল। বাদলে ঘাট বড় পিছল হইয়াছে—পাছে পিছলে পা পিছলাইয়া স্ত্রীলোকটি জলে পড়িয়া গিয়া বিপদগ্রস্ত হয় ভাবিয়া গোবিন্দলাল কিছু ব্যস্ত হইলেন। পুষ্পমণ্ডপ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "কে গা তুমি? আজ ঘাটে নামিও না—বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে।"

স্ত্রীলোকটি তাঁহার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। বৃষ্টি পড়িতেছিল—বোধ হয় বৃষ্টির শব্দে সে ভালো করিয়া শুনিতে পায় নাই। সে কুক্ষিস্থ কলসী ঘাটে নামাইল। সোপান পুনরারোহণ করিল। ধীরে-ধীরে গোবিন্দলালের পুষ্পো-

ঘাটাভিমুখে চলিল। উদ্যান-দ্বার উদঘাটিত করিয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। গোবিন্দলালের কাছে মণ্ডপতলে গিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দলাল দেখিলেন, সম্মুখে রোহিণী।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ভিজিতে-ভিজিতে এখানে কেন রোহিণী?"

রো। আপনি কি আমাকে ডাকিলেন?

গো। ডাকি নাই। ঘাটে বড় পিছল, নামিতে বারণ করিতেছিলাম। দাঁড়াইয়া ভিজিতেছ কেন?

রোহিণী সাহস পাইয়া মণ্ডপমধ্যে উঠিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "লোকে দেখিলে কি বলিবে?"

রো। যা বলিবার, তা বলিতেছে। সে-কথা আপনার কাছে একদিন বলিব বলিয়া অনেক যত্ন করিতেছি।

গো। আমারও সে-সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। কে এ-কথা রটাইল? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন?

রো। সকল বলিতেছি। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি?

গো। না, আমার সঙ্গে আইস।

———

ষড়্‌বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত-নীল-চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী-শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ—মোহের জন্য হইয়াছিল।

গোবিন্দলাল প্রথমে এরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে; কিন্তু যেমন বাহ্যজগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনই অন্তর্জ্জগতে পাপের আকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়। গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল। কেননা, রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না।

ক্রমে কৃষ্ণকান্তের কানে রোহিণী ও গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্ত দুঃখিত হইলেন। গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক ঘটিলে তাঁহার বড় কষ্ট। মনে-মনে ইচ্ছা হইল, গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, শয়নমন্দির ত্যাগ করিতে পারিতেন না। সেখানে গোবিন্দলাল তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিতেন, কিন্তু সর্ব্বদা তিনি সেবকগণ-পরিবেষ্টিত থাকিতেন, গোবিন্দলালকে সকলের সাক্ষাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইল। হঠাৎ কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যে, বুঝি চিত্রগুপ্তের হিসাব-নিকাশ হইয়া আসিল; এ জীবনের সাগরসঙ্গম বুঝি সম্মুখে। আর বিলম্ব করিলে বুঝি বলা হইবে না। একদিন গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেইদিন কৃষ্ণকান্ত মনের কথা বলিবেন মনে করিলেন। গোবিন্দলাল দেখিতে আসিলেন।

কৃষ্ণকান্ত পার্শ্ববর্ত্তিগণকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। পার্শ্ববর্ত্তিগণ সকলে উঠিয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আজ কেমন আছেন ?"

কৃষ্ণকান্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আজ বড় ভালো নাই। তোমার এত রাত্রি হইল কেন ?"

গোবিন্দলাল সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া, কৃষ্ণকান্তের প্রকোষ্ঠ হস্তমধ্যে লইয়া নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন। অকস্মাৎ গোবিন্দলালের মুখ শুকাইয়া গেল। কৃষ্ণকান্তের জীবন-প্রবাহ অতি ধীরে-ধীরে বহিতেছে! গোবিন্দলাল কেবল বলিলেন, "আমি আসিতেছি।" কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহ হইতে নির্গত হইয়া গোবিন্দলাল একেবারে স্বয়ং বৈদ্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈদ্য বিস্মিত হইল। গোবিন্দ-লাল বলিলেন, "মহাশয়, শীঘ্র ঔষধ লইয়া আসুন, জ্যেষ্ঠতাতের অবস্থা বড় ভালো বোধ হইতেছে না।"

বৈদ্য শশব্যস্তে একরাশি বটিকা লইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন— কৃষ্ণকান্তের গৃহে গোবিন্দলাল বৈদ্য সহিত উপস্থিত হইলেন, কৃষ্ণকান্ত কিছু ভীত হইলেন, কবিরাজ হাত দেখিলেন, কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তেমন কিছু শঙ্কা হইতেছে কি ?"

বৈদ্য বলিলেন, "মনুষ্যশরীরে শঙ্কা কখন্ নাই ?"

কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন। বলিলেন, "কতক্ষণ মিয়াদ ?"

বৈদ্য বলিলেন, "ঔষধ খাওয়াইয়া পশ্চাৎ বলিতে পারিব।"

বৈদ্য ঔষধ মাড়িয়া সেবনজন্য কৃষ্ণকান্তের নিকট উপস্থিত করিলেন, কৃষ্ণকান্ত ঔষধের খল হাতে লইয়া একবার মাথায় স্পর্শ করাইলেন, তাহার পর ঔষধটুকু সমুদয় পিক্‌দানীতে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

বৈদ্য বিষণ্ণ হইলেন। কৃষ্ণকান্ত দেখিয়া বলিলেন, "বিষণ্ণ হইবেন না! ঔষধ খাইয়া বাঁচিবার বয়স আমার নহে। ঔষধের অপেক্ষা হরিনাম আমার উপকার। তোমরা হরিনাম করো, আমি শুনি।"

কৃষ্ণকান্ত ভিন্ন কেহই হরিনাম করিল না। কিন্তু সকলেই স্তম্ভিত, ভীত, বিস্মিত হইল।

কৃষ্ণকান্ত একাই ভয়শূন্য। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে বলিলেন, "আমার শিয়রে দেরাজের চাবি আছে, বাহির করো।"

গোবিন্দলাল বালিসের নীচে হইতে চাবি লইলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেরাজ খুলিয়া আমার উইল বাহির করো।"

গোবিন্দলাল দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার আমলা, মুহুরি ও দশজন গ্রামস্থ ভদ্রলোক ডাকাও।"

তখন নায়েব-মুহুরিতে ঘর ভরিয়া গেল। কৃষ্ণকান্ত একজন মুহুরিকে আজ্ঞা করিলেন, "আমার উইল পড়ো।"

মুহুরি পড়িয়া সমাপ্ত করিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "ও উইল ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। নূতন উইল লেখো।"

মুহুরি জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ লিখিব ?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "যেমন আছে, সব সেইরূপ, কেবল—"

"কেবল কি ?"

"কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া দিয়া তাহার স্থানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ভ্রমরের নাম লেখো। ভ্রমরের অবর্ত্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্দ্ধাংশ পাইবে, লেখো।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কেহ কোনো কথা কহিল না। মুহুরি গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিল, গোবিন্দলাল ইঙ্গিত করিলেন, "লেখো।"

মুহুরি লিখিতে আরম্ভ করিল। লেখা সমাপন হইলে কৃষ্ণকান্ত স্বাক্ষর করিলেন। সাক্ষিগণ স্বাক্ষর করিল। গোবিন্দলাল আপনি উপযাচক হইয়া উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষি-স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন।

উইলে গোবিন্দলালের এক কপর্দ্দকও নাই—ভ্রমরের অর্দ্ধাংশ।

সেই রাত্রে হরিনাম করিতে-করিতে তুলসীতলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোকগমন করিলেন।

———

সপ্তবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুসংবাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে যথেষ্ট দান করিতেন, সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য কাতর হইল।

সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রমর। এখন কাজেই-কাজেই ভ্রমরকে আনিতে হইল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পরদিনই গোবিন্দলালের মাতা উদ্যোগী হইয়া পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন। ভ্রমর আসিয়া কৃষ্ণকান্তের জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

গোবিন্দলালের সঙ্গে ভ্রমরের প্রথম সাক্ষাতে রোহিণীর কথা লইয়া কোনো মহাপ্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের শোকে সে-সকল কথা এখন চাপা পড়িয়া গেল। ভ্রমরের সঙ্গে গোবিন্দলালের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন ভ্রমর জ্যেষ্ঠশ্বশুরের জন্য কাঁদিতেছেন, গোবিন্দলালও অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

অতএব যে বড় হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল, সেটা গোলমালে মিটিয়া গেল। দুইজনেই তাহা বুঝিলেন। দুইজনেই মনে-মনে স্থির করিলেন যে, যখন প্রথম দেখায় কোনো কথাই হইল না, তবে আর গোলযোগ করিয়া কাজ নাই—গোলযোগের এ সময় নহে ; মানে-মানে কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া যাক্—তার পরে যাহার মনে যা থাকে, তাহা হইবে। তাই ভাবিয়া গোবিন্দলাল একদা উপযুক্ত

সময় বুঝিয়া ভ্রমরকে বলিয়া রাখিলেন, "ভ্রমর! তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে, কথাগুলি বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। পিতৃশোকের অধিক যে শোক, আমি সেই শোকে এক্ষণে কাতর। এখন আমি সে-সকল কথা তোমায় বলিতে পারি না। শ্রাদ্ধের পর যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব। ইহার মধ্যে সে-সকল কথার প্রসঙ্গে কোনো কাজ নাই।"

ভ্রমর অতি কষ্টে নয়নাশ্রু সংবরণ করিয়া বাল্যপরিচিত দেবতা কালী, দুর্গা, শিব, হরি স্মরণ করিয়া বলিলেন, "আমারও কিছু বলিবার আছে। তোমার যখন অবকাশ হইবে, জিজ্ঞাসা করিও।"

আর কোনো কথা হইল না। দিন যেমন কাটিত, তেমনি কাটিতে লাগিল; দাসদাসী, গৃহিণী, পৌরস্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন কেহ জানিতে পারিল না যে, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে, এ চারু প্রেম-প্রতিমায় ঘুণ লাগিয়াছে। কিন্তু ঘুণ লাগিয়াছে তো সত্য। যাহা ছিল, তাহা আর নাই। যে হাসি ছিল, সে হাসি আর নাই। ভ্রমর কি হাসেন না? গোবিন্দলাল কি হাসেন না? হাসেন; কিন্তু সে হাসি আর নাই।

অষ্টাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

তারপর কৃষ্ণকান্ত রায়ের ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধ হইয়া গেল।

কোনমতে শ্রাদ্ধের গোল থামিলে, শেষে উইল পড়ার মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। উইল পড়িয়া হরলাল দেখিলেন, উইলের বিস্তর সাক্ষী, কোনো গোল করিবার সম্ভাবনা নাই। হরলাল শ্রাদ্ধান্তে স্বস্থানে গমন করিলেন।

উইল পড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন, "উইলের কথা শুনিয়াছ ?"

ভ্র। কি ?

গো। তোমার অর্দ্ধাংশ।

ভ্র। আমার, না তোমার ?

গো। এখন আমার-তোমার একটু প্রভেদ হইয়াছে। আমার নয়,—তোমার।

ভ্র। তাহা হইলেই তোমার।

গো। তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।

ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল; কিন্তু ভ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিলেন, "তবে কি করিবে ?"

গো। যাহাতে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারি, তাহাই করিব।

ভ্র। সে কি ?

গো। দেশে-দেশে ভ্রমণ করিয়া চাকরির চেষ্টা করিব।

ভ্র। বিষয় আমার জ্যেষ্ঠশ্বশুরের নহে, আমার শ্বশুরের। তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী,—আমি নহি। জ্যেঠার উইল করিবার কোনো

শক্তিই ছিল না। উইল অসিদ্ধ। আমার পিতা শ্রাদ্ধের সময়ে নিমন্ত্রণে আসিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিষয় তোমার, আমার নহে।

গো। আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না। তিনি যখন তোমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন বিষয় তোমার, আমার নহে।

ভ্র। যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি না হয় তোমাকে লিখিয়া দিতেছি।

গো। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবন-ধারণ করিতে হইবে?

ভ্র। তাহাতেই-বা ক্ষতি কি? আমি তোমার দাসানুদাসী বৈ তো নই।

গো। আজিকালি ও-কথা সাজে না, ভ্রমর!

ভ্র। কি করিয়াছি?

গো। মনে করিয়া দেখ!

ভ্র। অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়াছে, আমার শত সহস্র অপরাধ হইয়াছে, আমায় ক্ষমা করো। আমি কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।

ভ্রমর পায়ে পড়িয়া কাঁদিতেছেন,—"ক্ষমা করো, আমি বালিকা।"

গোবিন্দলাল কথা কহিলেন না। তাহার অগ্রে আলুলায়িত-কুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা! গোবিন্দলাল কথা কহিলেন না। গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিলেন, "এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তাহার রূপ আছে। এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব। আমার এ অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যেদিন ইচ্ছা, সেইদিন ভাঙিয়া ফেলিব।"

যিনি অনন্ত সুখ-দুঃখের বিধাতা, অন্তর্য্যামী, কাতরের বন্ধু, অবশ্যই তিনি এ-কথাগুলি শুনিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা শুনিলেন না। নীরব হইয়া রহিলেন। গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিলেন। তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্ত-প্রভাবশালিনী, প্রভাত-শুক্রতারারূপিণী, রূপতরঙ্গিণী চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিলেন। ভ্রমর উত্তর না পাইয়া বলিলেন, "কি, বলো ?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।"

ভ্রমর পদত্যাগ করিলেন, উঠিলেন ; বাহিরে যাইতেছিলেন, চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

ঊনত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

'কি অপরাধ করিয়াছি, যে আমাকে ত্যাগ করিবে ?' এ-কথা ভ্রমর গোবিন্দলালকে মুখে বলিতে পারিলেন না—কিন্তু এই ঘটনার পর পলে-পলে মনে-মনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"আমার কি অপরাধ ?"

গোবিন্দলালও মনে-মনে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন যে, ভ্রমরের কি অপরাধ ? ভ্রমরের যে বিশেষ গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, তাহা গোবিন্দলালের মনে একপ্রকার স্থির হইয়াছে, কিন্তু অপরাধটা কি, তাহা তত ভাবিয়া দেখেন নাই। ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হইত, ভ্রমর যে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছিল, অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে এত কঠিন পত্র লিখিয়াছিল,—একবার তাঁহাকে মুখে সত্য-মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিল না, এই তাহার অপরাধ। আমরা কুমতি-সুমতির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গোবিন্দলালের হৃদয়ে পাশাপাশি উপবেশন

করিয়া কুমতি-সুমতি যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহা সকলকে শুনাইব।

কুমতি বলিল, "ভ্রমরের প্রথম এইটি অপরাধ—এই অবিশ্বাস।"

সুমতি উত্তর করিল, "যে অবিশ্বাসের যোগ্য, তাহাকে অবিশ্বাস না করিবে কেন? তুমি রোহিণীর চিন্তায় আনন্দ উপভোগ করিতেছ, ভ্রমর সেইটা সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়াই কি তাহার এত দোষ?"

কুমতি। এখন যেন আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্তু যখন ভ্রমর অবিশ্বাস করিয়াছিল, তখন আমি নির্দ্দোষী।

সুমতি। দুদিন আগে-পাছেতে বড় আসিয়া যায় না!

কুমতি। তোর সঙ্গে ঝগড়ায় আমি পারিব না।

সুমতি। সে-সব কাজের কথা নয়, আসল রাগের কারণ কি, বলিব? আসল কথা—রোহিণী। কালো ভোমরা আর ভালো লাগে না। শুধু কি তাই? আরও আছে। কৃষ্ণকান্তের উইল। বুড়া মনে-মনে জানিত, ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গেলে, বিষয় তোমারই রহিল। ইহাও জানিত যে, ভ্রমর এক মাসের মধ্যে তোমাকে উহা লিখিয়া দিবে। তোমাকে একটু কুপথগামী দেখিয়া তোমার চরিত্র শোধনের জন্য তোমাকে ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গেল।

কুমতি। তাহা সত্যই। আমি কি স্ত্রীর মাসহারা খাইব নাকি?

সুমতি। তোমার বিষয় তুমি কেন ভ্রমরের কাছে লিখিয়া লও না?

কুমতি। স্ত্রীর দানে দিনপাত করিব?

সুমতি। তবে আর কি করিবে? গোল্লায় যাও।

তখন কুমতিতে-সুমতিতে ভারি চুলোচুলি ঘুষোঘুষি আরম্ভ হইল।

ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলালের মা গোবিন্দলালকে বলিলেন, "কর্ত্তারা একে-একে স্বর্গারোহণ করিলেন, এখন আমার সময় নিকট হইয়া আসিল, তুমি পুত্রের কাজ করো, এই সময় আমাকে কাশী পাঠাইয়া দাও।"

গোবিন্দলাল হঠাৎ এ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ; বলিলেন, "চলো, আমি তোমাকে আপনি কাশী রাখিয়া আসিব।" দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ভ্রমর একবার ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। কেহই তাঁহাকে নিষেধ করে নাই। অতএব ভ্রমরের অজ্ঞাতে গোবিন্দলাল কাশীযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিজনামে কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহা গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলেন। কাঞ্চনহীরকাদি মূল্যবান্ বস্তু যাহা নিজের সম্পত্তি ছিল—তাহা বিক্রয় করিলেন। এইরূপে প্রায় লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইল। গোবিন্দলাল ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে দিনপাত করিবেন স্থির করিলেন।

তখন মাতৃসঙ্গে কাশীযাত্রার দিন স্থির করিয়া ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন। শাশুড়ী কাশীযাত্রা করিবেন শুনিয়া ভ্রমর তাড়াতাড়ি আসিলেন। আসিয়া শাশুড়ীর চরণে ধরিয়া অনেক বিনয় করিলেন ; শাশুড়ীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "মা, আমি বালিকা—আমায় একা রাখিয়া যাইও না—আমি সংসারধর্ম্মের কি বুঝি ? মা,—সংসার সমুদ্র—আমাকে এ-সমুদ্রে একা ভাসাইয়া যাইও না।"

শাশুড়ী বলিলেন, "তোমার বড় ননদ রহিল, সেই তোমাকে আমার মত যত্ন করিবে—আর তুমিও গৃহিণী হইয়াছ।"

ভ্রমর কিছুই বুঝিলেন না—কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

ভ্রমর দেখিলেন, বড় বিপদ সম্মুখে। শাশুড়ী ত্যাগ করিয়া চলিলেন—আবার স্বামীও তাঁহাকে রাখিতে চলিলেন—তিনিও রাখিতে গিয়া বুঝি আর না আইসেন। ভ্রমর গোবিন্দলালের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—বলিলেন, "কতদিনে আসিবে, বলিয়া যাও।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "বলিতে পারি না। আসিতে বড় ইচ্ছা নাই।"

ভ্রমর পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মনে ভাবিলেন, "ভয় কি? বিষ খাইব।"

তারপর স্থিরীকৃত যাত্রার দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে গোবিন্দলাল অন্যান্য পৌরস্ত্রীগণকে যথোচিত সম্বোধন করিয়া, রোরুদ্যমানা ভ্রমরের কাছে বিদায় লইতে গেলেন। ভ্রমরকে রোদনবিবশা দেখিয়া তিনি যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে না পারিয়া কেবল বলিলেন, "ভ্রমর! আমি মাকে রাখিতে চলিলাম।"

ভ্রমর চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, "মা সেখানে বাস করিবেন। তুমি আসিবে না কি?"

এ-কথা যখন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাঁহার স্বরের স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, তাঁহার অধরে স্থিরপ্রতিজ্ঞা দেখিয়া গোবিন্দলাল কিছু বিস্মিত হইলেন। হঠাৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ভ্রমর স্বামীকে নীরব দেখিয়া পুনরপি বলিলেন, "দেখ, তুমি আমাকে শিখাইয়াছ—সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম, সত্যই একমাত্র সুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও—আমি তোমার আশ্রিতা বালিকা, আমায় প্রবঞ্চনা করিও না—কবে আসিবে?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে সত্যই শোনো। ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।"

ভ্রমর। কেন ইচ্ছা নাই—তাহা বলিয়া যাইবে না কি?

গো। এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাস হইয়া থাকিতে হইবে।

ভ্রমর। তাহাতেই-বা ক্ষতি কি? আমি তো তোমার দাসানুদাসী।

গো। আমার দাসানুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানালায় বসিয়া থাকিবে, তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না!

ভ্রমর। তাহার জন্য কত পায়ে ধরিয়াছি—এক অপরাধ কি মার্জ্জনা হয় না?

গো। এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী।

ভ্রমর। তা নয়, আমি এবার বাপের বাড়ী গিয়া বাপের সাহায্যে যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ।

এই বলিয়া ভ্রমর একখানা কাগজ দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, "পড়ো।"

গোবিন্দলাল পড়িয়া দেখিলেন—দানপত্র। ভ্রমর উচিত-মূল্যের ষ্ট্যাম্পে আপনার সমুদয় সম্পত্তি স্বামীকে দান করিতেছেন। তাহা রেজেষ্টারী হইয়াছে। গোবিন্দলাল পড়িয়া বলিলেন, "তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ, কিন্তু তোমায়-আমায় কি সম্বন্ধ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে, তুমি বিষয় দান করিবে, আমি ভোগ করিব—এ সম্বন্ধ নহে।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল বহুমূল্য দানপত্রখানি খণ্ড-খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

ভ্রমর বলিলেন, "পিতা বলিয়া দিয়াছেন, ছিঁড়িয়া ফেলা বৃথা। সরকারীতে ইহার নকল আছে।"

গো। থাকে থাক্। আমি চলিলাম।

ভ্র। কবে আসিবে?

গো। আসিব না।

ভ্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা—তোমার দাসানুদাসী—তোমার কথার ভিখারী—আসিবে না কেন?

গো। ইচ্ছা নাই।

ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি?

গো। বুঝি আমার তাও নাই।

বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিলেন। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল—ভ্রমর যোড় হাত করিয়া অবিকম্পিত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "তবে যাও—পারো, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, করো,—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও, একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও, একদিন তুমি খুঁজিবে, এ-পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়? দেবতা সাক্ষী। যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায়-আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বলো যে, আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ-কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম

মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।”

এই বলিয়া ভ্রমর ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গজেন্দ্র-গমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

ভ্রমর তখন যুক্তকরে মনে মনে ঊর্দ্ধমুখে দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—“কেহ আমাকে বলিয়া দাও, আমার কি দোষে এই সতেরো বৎসরমাত্র বয়সে এমন অসম্ভব দুর্দ্দশা ঘটিল। আমায় স্বামী ত্যাগ করিল। আমি এই বয়সে স্বামীর স্নেহ ভিন্ন আর কিছু ভালোবাসি নাই—ইহলোকে আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই—তবে আমি আজ এই বয়সে তাহাতে নিরাশ হইলাম কেন ?”

ভ্রমর কাঁদিয়া-কাটিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন,—দেবতারা নিষ্ঠুর। যখন দেবতা নিষ্ঠুর, তখন মনুষ্য আর কি করিবে, কেবল কাঁদিবে। ভ্রমর কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ধীরে-ধীরে বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। গোবিন্দলাল চক্ষের জল মুছিতে-মুছিতে আসিলেন। বালিকার অতি সরল যে প্রীতি অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায়-কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিনরাত্রি ছুটিতেছে, ভ্রমরের কাছে সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দ-লালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ

করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না। ভাবিলেন, যাহা করিয়াছি, তাহা আর এখন ফিরে না—এখন তো যাই, এখন যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই বুঝি আর ফেরা হইবে না। যাহা হউক, যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই।

সেই সময় যদি গোবিন্দলাল দুই পা ফিরিয়া গিয়া ভ্রমরের রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়া একবার বলিতেন—"ভ্রমর! আমি আবার আসিয়াছি", তবে সকল মিটিত। গোবিন্দলালের অনেকবার সে ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলেও তাহা করিলেন না। ইচ্ছা হইলেও একটু লজ্জা হইল। ভাবিলেন, এত তাড়াতাড়ি কি? যখন মনে করিব, তখন ফিরিব। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। আবার ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। যাহা হয়, একটা স্থির করিবার বুদ্ধি হইল না। যে-পথে যাইতেছেন, সেই পথে চলিলেন, তিনি চিন্তাকে বর্জ্জন করিয়া বহির্ব্বাটিতে আসিয়া সজ্জিত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক কশাঘাত করিলেন। পথে যাইতে-যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয়মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম বৎসর

হরিদ্রাগ্রামের বাড়ীতে সংবাদ আসিল—গোবিন্দলাল মাতা প্রভৃতি সঙ্গে নির্বিঘ্নে সুস্থ শরীরে কাশীধামে পৌঁছিয়াছেন। ভ্রমরের কাছে কোনো পত্র আসিল না। পত্রাদি আমলাবর্গের কাছে আসিতে লাগিল। অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখিলেন না।

এক মাস গেল, দুই মাস গেল, পত্রাদি আসিতে লাগিল। শেষ একদিন সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাড়ী যাত্রা করিয়াছেন।

ভ্রমর শুনিয়া বুঝিলেন যে, গোবিন্দলাল কেবল মাকে ভুলাইয়া অন্যত্র গমন করিয়াছেন। বাড়ী আসিবেন, এমন ভরসা হইল না।

এই সময়ে ভ্রমর গোপনে সর্ব্বদা রোহিণীর সংবাদ লইতে লাগিলেন। রোহিণী রাঁধে, বাড়ে, খায়, গা ধোয়, জল আনে, আর কিছুই সংবাদ নাই। ক্রমে একদিন সংবাদ আসিল, রোহিণী পীড়িতা। ঘরের ভিতর মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, বাহির হয় না। ব্রহ্মানন্দ আপনি রাঁধিয়া খায়।

তারপর একদিন সংবাদ আসিল যে, রোহিণী কিছু সারিয়াছে, কিন্তু পীড়ার মূল যায় নাই। শূলরোগ—চিকিৎসা নাই—রোহিণী আরোগ্য জন্য তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইবে। শেষ সংবাদ—রোহিণী হত্যা দিতে তারকেশ্বরে গিয়াছে, একাই গিয়াছে,—কে সঙ্গে যাইবে।

এদিকে তিন-চারি মাস গেল,—গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিলেন না। পাঁচ-ছয় মাস হইল, গোবিন্দলাল ফিরিলেন না, ভ্রমরের রোদনের শেষ নাই। কেবল মনে করিতেন, এখন কোথায় আছেন,—কেমন আছেন—সংবাদ পাইলেই বাঁচি।

শেষ ননন্দাকে বলিয়া শাশুড়ীকে পত্র লিখাইলেন—"আপনি মাতা, অবশ্য পুত্রের সংবাদ পান।" শাশুড়ী লিখিলেন, "তিনি গোবিন্দলালের সংবাদ পাইয়া থাকেন। গোবিন্দলাল প্রয়াগ, মথুরা, জয়পুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আপাততঃ দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্র সেখান হইতে স্থানান্তরে গমন করিবেন। কোথাও স্থায়ী হইতেছেন না।"

এদিকে রোহিণীও আর ফিরিল না। ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ জানেন, রোহিণী কোথায় গেল!

ভ্রমর আর সহ্য করিতে পারিলেন না। কাঁদিতে-কাঁদিতে ননন্দাকে বলিয়া শিবিকারোহণে পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

সেখানে গিয়া গোবিন্দলালের কোনো সংবাদ পাওয়া দুরূহ দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া হরিদ্রাগ্রামেও স্বামীর কোনো সংবাদ না পাইয়া আবার শাশুড়ীকে পত্র লিখিলেন। শাশুড়ী এবার লিখিলেন, "গোবিন্দলাল আর কোনো সংবাদ দেয় না; এখন সে কোথায় আছে, জানি না। কোনো সংবাদ পাই না।" এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল। প্রথম বৎসরের শেষে ভ্রমর রুগ্নশয্যায় শয়ন করিলেন। অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভ্রমর রুগ্নশয্যাশায়িনী শুনিয়া ভ্রমরের পিতা ভ্রমরকে দেখিতে আসিলেন। ভ্রমরের পিতার পরিচয় আমরা সবিশেষ দিই নাই—এখন দিব। তাঁহার পিতা মাধবীনাথ সরকারের বয়স একচত্বারিংশৎ বৎসর। তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ ; তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে মতভেদ ছিল। অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিত—অনেকে বলিত, তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই। তিনি যে চতুর, তাহা সকলেই স্বীকার করিত এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত।

মাধবীনাথ কন্যার দশা দেখিয়া অনেক রোদন করিলেন। দেখিলেন—সেই শ্যামাসুন্দরী, যাহার সর্ব্বাবয়ব সুললিত গঠন ছিল—এক্ষণে বিশুষ্কবদন, শীর্ণ-শরীর, প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্ননয়নেন্দীবর। ভ্রমর অনেক কাঁদিলেন। শেষে উভয়ে রোদন সংবরণ করিলে পর ভ্রমর বলিলেন, "বাবা, আমার বোধহয়, আর দিন নাই। আমায় কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম করাও। আমি ছেলেমানুষ হ'লে কি হয়, আমার তো দিন ফুরালো। আর বিলম্ব করিব কেন? আমার অনেক টাকা আছে, আমি ব্রতনিয়ম করিব। কে এ-সকল করাইবে? বাবা, তুমি আমার ব্যবস্থা করো।"

মাধবীনাথ বলিলেন, "তোমার একটু শরীর সারুক, তারপর।"

ভ্র। এ শরীর কি আর সারিবে?

মাধ। সারিবে মা—কি হইয়াছে? তোমার একটুও এখানে চিকিৎসা হইতেছে না—কেমন করিয়াই-বা হইবে? কে চিকিৎসা করাইবে? তুমি এখন আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাকে বাড়ীতে চিকিৎসা করাইব। আমি এখন দুই দিন এখানে থাকিব, তাহার পর তোমাকে সঙ্গে করিয়া রাজগ্রামে যাইব।

রাজগ্রাম ভ্রমরের পিত্রালয়।

কন্যার নিকট হইতে বিদায় হইয়া মাধবীনাথ কন্যার কার্য্যকারক-বর্গের নিকট গেলেন। দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বাবুর কোনো পত্রাদি আসিয়া থাকে?"

দেওয়ানজী উত্তর করিল, "কিছু না।"

মাধবীনাথ। তিনি এখন কোথায় আছেন?

দেওয়ানজী। তাঁহার কোনো সংবাদই আমরা কেহ বলিতে পারি না। তিনি কোনো সংবাদই পাঠান না।

মাধ। কাহার নিকট এ-সংবাদ পাইতে পারিব?

দে। তাহা জানিলে তো আমরা সংবাদ লইতাম। বাবুর এক্ষণে অজ্ঞাতবাস।

অগত্যা মাধবীনাথ কন্যাকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ কন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহার প্রতিকার করিবেন। গোবিন্দলাল ও রোহিণী এই অনিষ্টের মূল! অতএব প্রথমেই সন্ধান করা কর্ত্তব্য, সেই পামর-পামরী কোথায় আছে! নচেৎ দুষ্টের দমন হইবে না—ভ্রমরও মরিবে।

তাহারা একেবারে লুকাইয়াছে। যে-সকল সূত্রে তাহাদের ধরিবার সম্ভাবনা, সকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে, পদচিহ্নমাত্র মুছিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মাধবীনাথ বলিলেন যে, "যদি আমি তাহাদের সন্ধান না করিতে পারি, তবে বৃথাই আমার পৌরুষের শ্লাঘা করি।"

এইরূপ স্থির-সংকল্প করিয়া মাধবীনাথ একাকী রায়দিগের বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। হরিদ্রাগ্রামে একটি পোষ্ট-আফিস ছিল; মাধবীনাথ ধীরে-ধীরে নিরীহ ভালোমানুষের মত সেখানে গিয়া দর্শন দিলেন। পোষ্টমাষ্টারবাবুকে বলিলেন, "আপনার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসা হইয়াছে।"

পো। কি কথা মহাশয়?

মাধবী। ব্রহ্মানন্দকে চিনেন?

পো। চিনি না—চিনি—ভালো চিনি না।

মাধবীনাথ মনে-মনে হাসিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন,

কৃষ্ণকান্তের উইল—

—গোবিন্দলালের হাতে হাত রাখিয়া ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

১১৫ পৃষ্ঠা

"ওহে বাপু, তুমি অমনি কথা কবে না, তা জানি। সেজন্যে কিছু সঙ্গেও আনিয়াছি।"

তখন পোষ্টবাবু হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিলেন, "কি কন্?"

মাধ। কই এই, ব্রহ্মানন্দের নামে কোনো চিঠিপত্র ডাকঘরে আসিয়া থাকে?

পো। আসে।

মাধ। কতদিন অন্তর?

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, "আমরা কি পোষ্ট-আফিসের খবর যাকে-তাকে বলি? কে তুমি?"

মাধ। আমার নাম, মাধবীনাথ সরকার। বাড়ী—রাজগ্রাম। আমার পাল্লায় কত লাঠিয়াল আছে, খবর রাখো?

পোষ্টবাবুর ভয় হইল—মাধবীবাবুর নাম ও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ শুনিয়াছিলেন। পোষ্টবাবু একটু চুপ করিলেন।

মাধবীনাথ বলিলেন, "আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, সত্য-সত্য জবাব দাও। কিছু তঞ্চক করিও না। করিলে তোমায় কিছু দিব না—এক পয়সাও নহে। কিন্তু যদি না বলো, মিথ্যা বলো, তবে তোমার ঘরে আগুন দিব, তোমার ডাকঘর লুঠ করিব, আদালতে প্রমাণ করাইব যে, তুমি নিজে লোক দিয়া সরকারী টাকা অপহরণ করিয়াছ—কেমন, এখন বলিবে?"

পোষ্টবাবু থরহরি কাঁপিতে লাগিলেন, বলিলেন, "আপনি রাগ করেন কেন? আমি তো আপনাকে চিনিতাম না। বাজে লোক মনে করিয়াই ওরূপ করিয়াছিলাম—আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা বলিব।"

মাধ। কতদিন অন্তর ব্রহ্মানন্দের চিঠি আসে ?

পো। প্রায় মাসে-মাসে—ঠিক ঠাওর নাই।

মাধ। তবে, রেজেষ্ট্রী করিয়াই চিঠি আসে ?

পো। হ্যাঁ—প্রায় অনেক চিঠি রেজেষ্টারী-করা।

মাধ। কোন্ আফিস হইতে রেজেষ্টারী হইয়া আসে ?

পোষ্টমাষ্টার রসিদ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। একখানি পড়িয়া কহিলেন, "প্রসাদপুর"।

মাধ। প্রসাদপুর কোন্ জেলা ? তোমাদের লিষ্টি দেখ।

পোষ্টমাষ্টার কাঁপিতে-কাঁপিতে ছাপানো লিষ্টি বাহির করিয়া বলিলেন, "যশোর"।

মাধ। দেখ তবে, আর কোথা-কোথা হইতে রেজেষ্টারী-চিঠি উহার নামে আসিয়াছে। সব রসিদ দেখ।

পোষ্টবাবু দেখিলেন, ইদানীন্তন যত পত্র আসিয়াছে, সকলই প্রসাদপুর হইতে। মাধবীনাথ পোষ্টমাষ্টারবাবুর কম্পমান হস্তে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মাধবীনাথ এইসকল অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন, গোবিন্দলাল—যশোহরের প্রসাদপুরে অবস্থান করিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ হাসিতে-হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। মাধবীনাথ গোবিন্দলাল ও রোহিণীর অধঃপতন-কাহিনী সকলই লোক-পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দের অবস্থাও তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন—জানিতেন যে, রোহিণী ভিন্ন তাহার আর কেহই নাই। মাধবীনাথ তখন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মানন্দ আসিয়া নিকটে বসিল।

পরস্পরের স্বাগত জিজ্ঞাসার পর মাধবীনাথ বলিলেন, "আপনার কোনো বিপদ্-আপদ্ পড়িলে, আমাদিগকেই দেখিতে হয়—তাই আপনাকে ডাকাইয়াছি।"

ব্রহ্মানন্দের মুখ শুকাইল। বলিল, "কি বিপদ্ মহাশয় ?"

মাধ। আপনার কাছে একখানা চোরা-নোট আছে। চোরা-নোট প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে। পুলিশের লোক আমার কাছে নোটের নম্বর রাখিয়া গিয়াছে। যদি সে নম্বরের নোট না হয়, তবে ভয় কি ? নম্বর বদলাইতে কতক্ষণ, এবারকার প্রসাদপুরের পত্রখানি লইয়া আইস দেখি, নোটের নম্বর দেখি।

ব্রহ্মানন্দ থর-থর কাঁপিতে লাগিল ; মাধবীনাথের পায়ে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল,—"আপনি রক্ষা করুন।"

মাধবীনাথ বলিলেন, "কোনো ভয় নাই, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি।"

মাধবীনাথের আদেশমত একজন দ্বারবান্ ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে গেল। ব্রহ্মানন্দ রোহিণীর পত্র লইয়া আসিল। সেই পত্রে মাধবীনাথ যাহা-যাহা খুঁজিতেছিলেন, সকলই পাইলেন।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এ-নম্বরের নোট নহে—তুমি ঘরে যাও।"

ব্রহ্মানন্দ মৃতদেহে প্রাণ পাইল, ঊর্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিল।

মাধবীনাথ কন্যাকে চিকিৎসার্থ স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তথায় উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিয়া স্বয়ং কলিকাতায় চলিলেন। ভ্রমর অনেক আপত্তি করিলেন,—মাধবীনাথ শুনিলেন না। "শীঘ্রই আসিতেছি" বলিয়া কন্যাকে প্রবোধ দিয়া গেলেন।

কলিকাতায় নিশাকর দাস নামে মাধবীনাথের একজন বড় আত্মীয় ছিলেন। নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট-দশ বৎসর বয়ঃকনিষ্ঠ। নিশাকর কিছু করেন না—পৈত্রিক বিষয় আছে—কেবল একটু-একটু গীতবাদ্যের অনুশীলন করেন; নিষ্কর্ম্মা বলিয়া সর্ব্বদা পর্য্যটনে গমন করিয়া থাকেন। মাধবীনাথ তাঁহার কাছে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে, বেড়াইতে যাইবে ?"

নিশা। কোথায় ?

মাধ। যশোর।

নিশা। সেখানে কেন ?

মাধ। নীলকুঠি কিনবো।

নিশা। চলো!

তখন উদ্যোগ করিয়া দুই বন্ধু এক দিনের মধ্যে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে প্রসাদপুর যাইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধীরে-ধীরে চিত্রানদী বহিতেছে—তীরে অশ্বত্থ, কদম্ব, আম্র, খর্জ্জুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোভিত উপবনে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া ডাকিতেছে। নিকটে গ্রাম নাই। প্রসাদপুর-নামে একটি ক্ষুদ্র বাজার প্রায় এক ক্রোশ পথ দূর। এখানে মনুষ্যসমাগম নাই দেখিয়া এক নীলকর সাহেব এখানে নীল-কুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে নীলকর এবং তাহার ঐশ্বর্য্য ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে—একজন বাঙ্গালী সেই জনশূন্য প্রান্তরস্থিত রম্য অট্টালিকা ক্রয় করিয়া তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পুষ্পে, প্রস্তরপুত্তলে, আসনে, দর্পণে, চিত্রে গৃহ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অভ্যন্তরে দ্বিতলস্থ বৃহৎ কক্ষ-মধ্যে নির্ম্মল সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়া রোহিণী দানেশ খাঁ ওস্তাদের কাছে গীতবাদ্য শিখিতেছে, পাশের ঘরে বসিয়া একজন যুবাপুরুষ নভেল পড়িতেছে।

এই যুবকটি আমাদের গোবিন্দলাল। প্রসাদপুরের নির্জ্জন বনমধ্যে এই প্রাসাদ গোবিন্দলাল ক্রয় করিয়াছেন। এইখানে তাঁরা দু'জনে থাকেন। এইসময় সেই প্রমোদ-গৃহের দ্বারে একজন অপরিচিত যুবাপুরুষ প্রবেশ করিল। সে যুবাপুরুষ হইল—নিশাকর দাস।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিশাকর গোবিন্দলালের সঙ্গে তাঁহার ঘরে সাক্ষাৎ করিলেন।

গো। আপনি কে?

নি। আমার নাম—রাসবিহারী দে।

গো। নিবাস?

নি। বরাহনগর।

নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "আপনার ভার্য্যা আমাকে বিষয়গুলি পত্তনি দিতে স্বীকার হইয়াছেন। কিন্তু আপনার অনুমতিসাপেক্ষ। তিনি আপনার ঠিকানাও জানেন না, পত্রাদি লিখিতেও ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং আপনার অভিপ্রায় জানিবার ভার আমার উপরেই পড়িল। আমি অনেক সন্ধানে আপনার ঠিকানা জানিয়া আপনার অনুমতি লইতে আসিয়াছি।"

গোবিন্দলাল কোনো উত্তর করিলেন না—বড় অন্যমনস্ক। অনেক দিনের পর ভ্রমরের কথা শুনিলেন—তাঁহার সেই ভ্রমর। প্রায় দুই বৎসর হইল।

নিশাকর কতক-কতক বুঝিলেন। পুনরপি বলিলেন, "আপনার যদি মত হয়, তবে একছত্র লিখিয়া দিন যে, আপনার কোনো আপত্তি নাই। তাহা হইলেই আমি উঠিয়া যাই।"

গোবিন্দলাল কিছুই উত্তর করিলেন না। নিশাকর বুঝিলেন, আবার বলিতে হইল, আবার সকল কথাগুলি বুঝাইয়া বলিলেন। গোবিন্দলাল একবার চিত্ত সংযত করিয়া কথাসকল শুনিলেন।

নিশাকরের সকল কথাই যে মিথ্যা, তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন ; কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা কিছুই বুঝেন নাই, পূর্ব্বকার উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার অনুমতি লওয়া অনাবশ্যক। বিষয় আমার স্ত্রীর, আমার নহে, বোধহয় তাহা জানেন। তাঁহা রযাঁহাকে ইচ্ছা পত্তনি দিবেন, আমার বিধিনিষেধ নাই। আমিও কিছু লিখিব না। বোধহয়, এখন আপনি আমাকে অব্যাহতি দিবেন।"

কাজে-কাজেই নিশাকরকে উঠিতে হইল ; তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। নিশাকর গেলে, গোবিন্দলাল দানেশ খাঁকে বলিলেন, "কিছু গাও।" কিন্তু গান শুনিতে-শুনিতে ভৃত্যকে বলিলেন, "আমি এখন একটু ঘুমাইব, আমি আপনি না উঠিলে আমাকে কেহ যেন উঠায় না।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল শয়নঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল তো ঘুমাইলেন না, খাটে বসিয়া দুই হাত মুখে দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

কেন যে কাঁদিলেন, তাহা জানি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিলেন, কি নিজের জন্য কাঁদিলেন তাহা বলিতে পারি না। বোধহয় দুই-ই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যখন নিশাকর আসিয়া বড় হলে বসিল, রোহিণীকে সুতরাং পাশের কামরায় প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নয়নের অন্তরাল হইল মাত্র—শ্রবণের নহে। কথোপকথন যাহা হইল, সকলই কান পাতিয়া শুনিল। বরং দ্বারের পর্দ্দাটি একটু সরাইয়া নিশাকরকে দেখিতে লাগিল। নিশাকরও দেখিল যে, পর্দ্দার পাশ হইতে একটি স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিতেছে।

রোহিণী শুনিল যে, নিশাকর অথবা রাসবিহারী হরিদ্রাগ্রাম হইতে আসিয়াছে। রূপো চাকরও রোহিণীর মত সকল কথা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। নিশাকর উঠিয়া গেলেই রোহিণী পর্দ্দার পাশ হইতে মুখ বাহির করিয়া আঙুলের ইসারায় রূপোকে ডাকিল। রূপো কাছে আসিলে তাহাকে কানে-কানে বলিল, "যা বলি, তা পারবি? বাবুকে সকল কথা লুকাইতে হইবে। যা করিবি, তাহা যদি বাবু কিছু না জানিতে পারেন, তবে তোকে পাঁচ টাকা বক্‌শিস্ দিব।"

রূপো মনে ভাবিল, আজ না জানি উঠিয়া কার মুখ দেখিয়াছিলাম—আজ তো দেখছি, টাকা রোজগারের দিন, গরীব মানুষের দুই পয়সা এলেই ভালো, প্রকাশ্যে বলিল, "যা বলিবেন, তাই পারিব। কি আজ্ঞা করুন।"

রো। ঐ বাবুর সঙ্গে-সঙ্গে নামিয়া যা, উনি আমার বাপের বাড়ীর দেশ থেকে এসেছেন। সেখানকার কোনো সংবাদ আমি কখনও পাই না—তার জন্য কত কাঁদি। যদি দেশ থেকে একটি লোক এসেছে, তাকে একবার আপনার জনের দুটো খবর জিজ্ঞাসা

করবো। তুই গিয়ে তাকে বসা। এমন জায়গায় বসা, যেন বাবু নীচে গেলে না দেখিতে পান। আর কেহ না দেখিতে পায়। আমি একটু নিরিবিলি পেলেই যাবো। যদি বস্‌তে না চায়, তবে কাকুতি-মিনতি করিস্‌।

রূপো বক্‌শিসের গন্ধ পাইয়াছে—"যে আজ্ঞা" বলিয়া ছুটিয়া চলিল।

নিশাকর কি অভিপ্রায়ে গোবিন্দলালকে ছলিতে আসিয়াছিলেন বলিতে পারিনা। কিন্তু তিনি নীচে আসিয়া যেরূপ আচরণ করিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধিমানে দেখিলে তাঁহাকে বড় অবিশ্বাস করিত। তিনি গৃহপ্রবেশদ্বারের কবাট, খিল, কব্জা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে রূপো খানসামা আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "একটু নিরবিলিতে আসুন।"

রূপো নিশাকরকে সঙ্গে করিয়া আপনার নির্জ্জন ঘরে লইয়া গেল। নিশাকরও বিনা ওজর-আপত্তিতে গেলেন। সেখানে নিশাকরকে বসিতে দিয়া—যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, রূপচাঁদ তাহা বলিল।

নিশাকর আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। নিজ অভিপ্রায়সিদ্ধির অতি সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "বাপু, তোমার মুনিব তো আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি তাঁর বাড়ীতে লুকাইয়া থাকি কি-প্রকারে?"

রূপো। আজ্ঞে, তিনি কিছু জানিতে পারিবেন না। এ-ঘরে তিনি কখনও আসেন না।

নিশা। না আসুন, কিন্তু যখন তোমার মাতাঠাকুরাণী নীচে আস্‌বেন, তখন যদি তোমার বাবু ভাবেন, কোথায় গেল, দেখি? যদি তাই ভাবিয়া পিছু-পিছু আসেন; কি কোনরকমে যদি আমার কাছে

তোমার মাতাঠাকুরাণীকে দেখেন, তবে আমার দশাটা কি হবে বলো দেখি ?

রূপচাঁদ চুপ করিয়া রহিল ; নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "এই মাঠের মাঝখানে ঘরে পুরিয়া আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পুঁতিয়া রাখিলেও আমার মা বল্‌তে নাই, বাপ বল্‌তেও নাই। তখন তুমিই আমাকে দু'ঘা লাঠি মারিবে—অতএব এমন কাজে আমি নাই। তোমার মাকে বুঝাইয়া বলিও যে, আমি ইহা পারিব না,—আর একটি কথা বলিও। তাঁহার খুড়া আমাকে কতকগুলি অতি ভারি কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছিল। আমি তোমার মাতাঠাকুরাণীকে সেই কথা বলিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলাম ; কিন্তু তোমার বাবু আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমার বলা হইল না, আমি চলিলাম।"

রূপো দেখিল, পাঁচ টাকা হাতছাড়া হয়। বলিল, "আচ্ছা, তা এখানে না বসেন, বাহিরে একটু তফাতে বসিতে পারেন না ?"

নিশা। আমিও সেই কথা ভাবিতেছিলাম। আসিবার সময় তোমাদের কুঠির নিকটে নদীর ধারে একটা বাঁধা ঘাট, তাহার কাছে দুইটা বকুলগাছ দেখিয়া আসিয়াছি। চেনো সে জায়গা ?

রূপো। চিনি।

নিশা। আমি গিয়া সেইখানে বসিয়া থাকি। সন্ধ্যা হইয়াছে—রাত্রি হইলে, সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না। তোমার মাতাঠাকুরাণী যদি সেইখানে আসিতে পারেন, তবেই সকল সংবাদ পাইবেন। তেমন-তেমন দেখিলে আমি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। ঘরে পুরিয়া যে আমাকে কুকুরমারা করিবে, আমি তাহাতে বড় রাজী নহি।

অগত্যা রূপো-চাকর রোহিণীর কাছে গিয়া, নিশাকর যেমন বলিল, তাহা নিবেদন করিল। এখন রোহিণীর মনের ভাব কি, তাহা আমরা বলিতে পারিনা। যখন মানুষ নিজে নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারেনা—আমরা কেমন করিয়া বলিব যে, রোহিণীর মনের ভাব এই। রোহিণী ব্রহ্মানন্দকে এত ভালোবাসিত যে, তাহার সংবাদ লইবার জন্য দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা হইবে, এমন খবর আমরা রাখিনা। বুঝি আরও কিছু ছিল। জানিনা, এই পাপীয়সীর পাপ-চিত্তে কি উদয় হইয়াছিল—কিন্তু রোহিণী স্বীকৃত হইল যে, প্রদোষ-কালে অবকাশ পাইলেই, গোপনে চিত্রার বাঁধাঘাটে একাকিনী সে নিশাকরের নিকট গিয়া খুল্লতাতের সংবাদ শুনিবে।

রূপচাঁদ আসিয়া সে-কথা নিশাকরের কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়া ধীরে-ধীরে হর্ষোৎফুল্ল মনে গাত্রোত্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিশাকর গোবিন্দলালের বাসগৃহের দ্বিতল কক্ষের বাতায়ন-নিঃসৃত উজ্জ্বল দীপালোক দর্শন করিতেছেন এবং মনে-মনে ভাবিতেছেন, "আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি। অথবা নৃশংসতাই-বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য, যখন বন্ধুর কন্যার জীবন রক্ষার্থ এ-কার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব।"

রাত্রি প্রহরাতীত হইল। তখন নিশাকর দেখিলেন, নিঃশব্দ-

তোমার মাতাঠাকুরাণীকে দেখেন, তবে আমার দশাটা কি হবে বলো দেখি ?

রূপচাঁদ চুপ করিয়া রহিল ; নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "এই মাঠের মাঝখানে ঘরে পুরিয়া আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পুঁতিয়া রাখিলেও আমার মা বল্‌তে নাই, বাপ বল্‌তেও নাই। তখন তুমিই আমাকে দু'ঘা লাঠি মারিবে—অতএব এমন কাজে আমি নাই। তোমার মাকে বুঝাইয়া বলিও যে, আমি ইহা পারিব না,—আর একটি কথা বলিও। তাঁহার খুড়া আমাকে কতকগুলি অতি ভারি কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছিল। আমি তোমার মাতাঠাকুরাণীকে সেই কথা বলিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলাম ; কিন্তু তোমার বাবু আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমার বলা হইল না, আমি চলিলাম।"

রূপো দেখিল, পাঁচ টাকা হাতছাড়া হয়। বলিল, "আচ্ছা, তা এখানে না বসেন, বাহিরে একটু তফাতে বসিতে পারেন না ?"

নিশা। আমিও সেই কথা ভাবিতেছিলাম। আসিবার সময় তোমাদের কুঠির নিকটে নদীর ধারে একটা বাঁধা ঘাট, তাহার কাছে দুইটা বকুলগাছ দেখিয়া আসিয়াছি। চেনো সে জায়গা ?

রূপো। চিনি।

নিশা। আমি গিয়া সেইখানে বসিয়া থাকি। সন্ধ্যা হইয়াছে—রাত্রি হইলে, সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না। তোমার মাতাঠাকুরাণী যদি সেইখানে আসিতে পারেন, তবেই সকল সংবাদ পাইবেন। তেমন-তেমন দেখিলে আমি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। ঘরে পুরিয়া যে আমাকে কুকুরমারা করিবে, আমি তাহাতে বড় রাজী নহি।

অগত্যা রূপো-চাকর রোহিণীর কাছে গিয়া, নিশাকর যেমন বলিল, তাহা নিবেদন করিল। এখন রোহিণীর মনের ভাব কি, তাহা আমরা বলিতে পারিনা। যখন মানুষ নিজে নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারেনা—আমরা কেমন করিয়া বলিব যে, রোহিণীর মনের ভাব এই। রোহিণী ব্রহ্মানন্দকে এত ভালোবাসিত যে, তাহার সংবাদ লইবার জন্য দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা হইবে, এমন খবর আমরা রাখিনা। বুঝি আরও কিছু ছিল। জানিনা, এই পাপীয়সীর পাপ-চিত্তে কি উদয় হইয়াছিল—কিন্তু রোহিণী স্বীকৃত হইল যে, প্রদোষ-কালে অবকাশ পাইলেই, গোপনে চিত্রার বাঁধাঘাটে একাকিনী সে নিশাকরের নিকট গিয়া খুল্লতাতের সংবাদ শুনিবে।

রূপচাঁদ আসিয়া সে-কথা নিশাকরের কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়া ধীরে-ধীরে হর্ষোৎফুল্ল মনে গাত্রোত্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিশাকর গোবিন্দলালের বাসগৃহের দ্বিতল কক্ষের বাতায়ন-নিঃসৃত উজ্জ্বল দীপালোক দর্শন করিতেছেন এবং মনে-মনে ভাবিতেছেন, "আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি। অথবা নৃশংসতাই-বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য, যখন বন্ধুর কন্যার জীবন রক্ষার্থ এ-কার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব।"

রাত্রি প্রহরাতীত হইল। তখন নিশাকর দেখিলেন, নিঃশব্দ-

পাদবিক্ষেপে রোহিণী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য নিশাকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা ?"

রোহিণীও নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য বলিল, "তুমি কে ?"

নিশাকর বলিল, "আমি রাসবিহারী !"

রোহিণী বলিল, "আমি রোহিণী।"

নিশা। এত রাত্রি হলো কেন ?

রোহিণী। একটু না দেখে-শুনে তো আস্‌তে পারিনে। কি জানি, কে কোথা দিয়ে দেখতে পাবে। তা, তোমার বড় কষ্ট হয়েছে।

নিশা। কষ্ট হোক, মনে-মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে।

রোহিণী। আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তাহ'লে আমার দশা এমন হইবে কেন ? একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এ-দেশে আসিয়াছি, আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।

এই কথা বলিতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া পিছন হইতে রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। রোহিণী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে ?"

গম্ভীরভাবে কে উত্তর করিল, "তোমার যম।"

রোহিণী চিনিল যে, গোবিন্দলাল। তখন আসন্ন বিপদ বুঝিয়া, চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়া রোহিণী ভীতকম্পিত-স্বরে বলিল, "ছাড়ো, ছাড়ো। আমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। আমি যেজন্য আসিয়াছি, এই বাবুকে নাহয় জিজ্ঞাসা করো।"

এই বলিয়া রোহিণী যেখানে নিশাকর বসিয়াছিল, সেই স্থানে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিল, কেহ সেখানে নাই। নিশাকর গোবিন্দলালকে দেখিয়া পলকমধ্যে কোথায় সরিয়া গিয়াছে। রোহিণী বিস্মিতা হইয়া বলিল, "কৈ, কেহ কোথাও নাই যে।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "এখানে কেহ নাই। আমার সঙ্গে ঘরে এসো।"

রোহিণী বিষণ্ণচিত্তে ধীরে-ধীরে গোবিন্দলালের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভৃত্যবর্গকে নিষেধ করিলেন, "কেহ উপরে আসিও না।"

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া নিভৃতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। রোহিণী নদীস্রোতো-বিকম্পিতা বেতসীর ন্যায় সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

গোবিন্দলাল মৃদুস্বরে বলিলেন, "রোহিণী!"

রোহিণী বলিল, "কেন?"

গো। তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে!

রো। কি?

গো। তুমি আমার কে?

রো। কেহ নই, যতদিন পায়ে রাখেন ততদিন দাসী, নহিলে কেহ নই।

গোবিন্দলাল আর দুঃখ-ক্রোধের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া রোহিণীকে পদাঘাত করিলেন। তারপর পিস্তল বাহির করিয়া রোহিণীকে গুলি করিলেন। রোহিণী গতপ্রাণা হইয়া ভূপতিতা হইল।

গোবিন্দলাল পিস্তল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অতি দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

পিস্তলের শব্দ শুনিয়া ভৃত্যেরা দেখিতে আসিল। তখন রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে। গোবিন্দলাল কোথাও নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় বৎসর

সেই রাত্রেই চৌকিদার থানায় গিয়া সংবাদ দিল যে, প্রসাদপুরের কুঠিতে খুন হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ থানা সে-স্থান হইতে ছয় ক্রোশ ব্যবধান। দারোগা আসিতে পরদিন বেলা প্রহরেক হইল। আসিয়া তিনি খুনের তদারকে প্রবৃত্ত হইলেন। রীতিমত সুরতহাল ও লাস তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন। পরে রোহিণীর মৃতদেহ বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া গোরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া চৌকিদারের সঙ্গে ডাক্তার-খানায় পাঠাইলেন। পরে স্নান করিয়া আহারাদি করিলেন। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া অপরাধীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথায় অপরাধী? গোবিন্দলাল রোহিণীকে আহত করিয়াই গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়াছিলেন, আর প্রবেশ করেন নাই। এক রাত্র এক দিন অবকাশ পাইয়া গোবিন্দলাল কোথায় কত দূর গিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। কোন্ দিকে পলাইয়াছেন,

কেহ জানেনা, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। গোবিন্দলাল প্রসাদপুরে কখনও নিজ নাম-ধাম প্রকাশ করেন নাই, সেখানে চুণিলাল দত্ত নাম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা ভৃত্যেরা এ-পর্য্যন্তও জানিত না। দারোগা কিছুদিন ধরিয়া একে-ওকে ধরিয়া জবানবন্দী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের কোনো অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে তিনি আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমারিপোর্ট দাখিল করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় বৎসর

ভ্রমর মরেন নাই। কেন মরিলেন না, তাহা জানিনা। এ-সংসারে বিশেষ দুঃখ এই যে, মরিবার উপযুক্ত সময়ে কেহ মরেনা, অসময়ে সবাই মরে। ভ্রমর যে মরিলেন না, বুঝি, ইহাই তাহার কারণ। যাহাই হউক, ভ্রমর উৎকট রোগ হইতে কিয়দংশ মুক্তি পাইয়াছেন। ভ্রমর আবার পিত্রালয়ে। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের যে সংবাদ আনিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী অতি সঙ্গোপনে তাহা জ্যেষ্ঠা কন্যা—ভ্রমরের ভগিনীর নিকট বলিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি গোপনে তাহা ভ্রমরের নিকট বলিয়াছিলেন। ভ্রমর শুনিলেন, তাঁহার স্বামী রোহিণীকে খুন করিয়া কোথায় পলাইয়াছেন কেহ জানেনা। ভ্রমর শুধু কাঁদিলেন, আর কথা কহিলেন না। তাঁহার

মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিলেন না। ভ্রমরের মর্ম্মান্তিক রোদন যামিনী কিছুই বুঝিলেন না। ভ্রমর মানসচক্ষে ধূমময় চিত্রবৎ এ-কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে তাহা দেখিতে পাইলেন। গোবিন্দলাল যে হত্যাকারী, এ-কথা ভ্রমর কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম বৎসর

ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেলেন। যদি স্বামী আসেন, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামী তো আসিলেন না! দিন গেল, মাস গেল—স্বামী তো আসিলেন না, কোনো সংবাদও আসিল না। এইরূপে তৃতীয় বৎসরও কাটিয়া গেল। গোবিন্দলাল আসিলেন না। তারপর চতুর্থ বৎসরও কাটিয়া গেল, গোবিন্দলাল আসিলেন না। এদিকে ভ্রমরের পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হাঁপানি কাসি রোগ—নিত্য শরীরক্ষয়—যম অগ্রসর—বুঝি আর ইহজন্মে দেখা হইল না!

তারপর পঞ্চম বৎসর প্রবৃত্ত হইল। পঞ্চম বৎসরে একটা বড় ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রামে সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছেন। সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন—সেইখান হইতে পুলিস ধরিয়া যশোহর আনিয়াছে, যশোহরে তাঁহার বিচার হইবে।

জনরবে এই সংবাদ ভ্রমর শুনিলেন। জনরবের সূত্র এই;—গোবিন্দলাল ভ্রমরের দেওয়ানজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি

জেলে চলিলাম—আমার পৈত্রিক বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অর্থব্যয় করা যদি তোমাদিগের অভিপ্রায়সম্মত হয়, তবে এই সময়। আমি তাহার যোগ্য নহি। আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই, তবে ফাঁসি যাইতে না হয়, এই ভিক্ষা। জনরবে এ-কথা বাড়ীতে জানাইও। আমি পত্র লিখিয়াছি, এ-কথা প্রকাশ করিও না।”

দেওয়ানজী পত্রের কথা প্রকাশ করিলেন না—জনরব বলিয়া অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইলেন।

ভ্রমর শুনিয়াই পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন, শুনিবামাত্র মাধবীনাথ কন্যার নিকটে আসিলেন। ভ্রমর তাঁহাকে নোটে-কাগজে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিয়া সজলনয়নে বলিলেন, “বাবা, এখন যা করিতে হয়, করো! দেখিও, আমি আত্মহত্যা না করি।”

মাধবীনাথও কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, “মা, নিশ্চিন্ত থাকিও, আমি আজই যশোহর যাত্রা করিলাম। কোনও চিন্তা করিও না। গোবিন্দলাল যে খুন করিয়াছে, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে, তোমার আটচল্লিশ হাজার টাকা বাঁচাইয়া আনিব—আমার জামাইকে দেশে আনিব।”

মাধবীনাথ তখন যশোহর যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন যে, প্রমাণের অবস্থা অতি ভয়ানক। ইন্‌স্পেক্টর ফিচেল খাঁ, মোকদ্দমা তদারক করিয়া সাক্ষী চালান দিয়াছিলেন। তিনি রূপো, সোনা প্রভৃতি যে-সকল সাক্ষীরা প্রকৃত অবস্থা জানিত তাহাদিগের কাহারও সন্ধান পান নাই। সোনা নিশাকরের কাছে ছিল—রূপো কোন্ দেশে গিয়াছিল কেহ জানেনা। প্রমাণের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া নগদ

কিছু দিয়া ফিচেল খাঁ তিনটি সাক্ষী তৈয়ারী করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত মাধবীনাথ সাক্ষী ভাঙাইয়া সব পণ্ড করিয়া দিলেন। বিচার হইল। রাজ-সাক্ষীর অভাবে বিচারক গোবিন্দলালকে খালাস দিলেন।

বিচারকালে সাক্ষীদিগের এইরূপ বিপক্ষতা দেখিয়া গোবিন্দলাল বিস্মিত হইতেছিলেন। পরে যখন ভীড়ের ভিতর মাধবীনাথকে দেখিলেন, তখনই সকল বুঝিতে পারিলেন। খালাস হইয়াও তাঁহাকে আর-একবার জেলে যাইতে হইল—সেখানে জেলার পরোয়ানা পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি যখন জেলে ফিরিয়া যান, তখন মাধবীনাথ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কানে-কানে বলিলেন, "জেল হইতে খালাস পাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আমার বাস, অমুক স্থান।"

কিন্তু গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস পাইয়া মাধবীনাথের কাছে গেলেন না। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না। মাধবীনাথ চারি-পাঁচ দিন তাঁহার সন্ধান করিলেন। কোনো সন্ধান পাইলেন না।

অগত্যা শেষে একাই হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ বৎসর

মাধবীনাথ আসিয়া ভ্রমরকে সংবাদ দিলেন, "গোবিন্দলাল খালাস হইয়াছে, কিন্তু বাড়ী আসিল না, কোথায় চলিয়া গেল, সন্ধান পাওয়া গেলনা।" মাধবীনাথ সরিয়া গেলে ভ্রমর অনেক কাঁদিলেন; কিন্তু কিজন্য কাঁদিলেন, বলিতে পারি না।

এদিকে গোবিন্দলাল খালাস পাইয়া প্রসাদপুরে গেলেন, গিয়া দেখিলেন, প্রসাদপুরের গৃহে কিছু নাই। গিয়া শুনিলেন যে, অট্টালিকায় তাঁহার যে-সকল দ্রব্য-সামগ্রী ছিল, তাহা কতক পাঁচ জনে লুটিয়া লইয়া গিয়াছিল—অবশিষ্ট লাওয়ারেশ বলিয়া বিক্রয় হইয়াছিল। কেবল বাড়ীটি পড়িয়া আছে—তাহার কবাট-চৌকাট পর্য্যন্ত বারো-ভূতে লইয়া গিয়াছে। প্রসাদপুরের বাজারে দুই-এক দিন বাস করিয়া গোবিন্দলাল বাড়ীর অবশিষ্ট ইট-কাঠ জলের দামে এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া যাহা-কিছু পাইলেন, তাহা লইয়া কলিকাতায় গেলেন।

কলিকাতায় অতি গোপনে সামান্য অবস্থায় গোবিন্দলাল দিনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রসাদপুর হইতে অতি অল্প টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহা এক বৎসরে ফুরাইয়া গেল। তারপর গোবিন্দলাল ভ্রমরকে লিখিলেন ঃ

"ভ্রমর !

"ছয় বৎসরের পর এ-পামর আবার তোমায় পত্র লিখিতেছে। প্রবৃত্তি হয় পড়িও, না প্রবৃত্তি হয়, না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিও।

"আমার অদৃষ্টে যাহা-যাহা ঘটিয়াছে, বোধহয় সকলই তুমি শুনিয়াছ। যদি বলি, সে আমার কর্ম্ম-ফল, তুমি মনে করিতে পারো, আমি তোমার মন-রাখা কথা বলিতেছি। কেননা আজি আমি তোমার কাছে ভিখারী।

"আমি এখন নিঃস্ব। তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিয়াছি। তীর্থস্থানে ভিক্ষা মিলিত। এখানে মিলেনা—সুতরাং আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি !

"আমার যাইবার এক স্থান ছিল—কাশীতে মাতৃক্রোড়ে। মার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে—বোধহয় তাহা তুমি জানো। সুতরাং আমার আর স্থান নাই—অন্ন নাই !

"তাই আমি মনে করিয়াছি, আবার হরিদ্রাগ্রামে এ-কালামুখ দেখাইব—নহিলে খাইতে পাইবনা। যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া পরদারনিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত করিল, তাহার আবার লজ্জা কি ? যে অন্নহীন, তাহার আবার লজ্জা কি ? আমি এ-কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিণী—বাড়ী তোমার—আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি,—আমায় তুমি স্থান দিবে কি ?

"পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে কি ?"

পত্র লিখিয়া সাত-পাঁচ আবার ভাবিয়া গোবিন্দলাল পত্র ডাকে দিলেন। যথাকালে পত্র ভ্রমরের হস্তে পৌঁছিল।

পত্র পাইয়াই ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিলেন। পত্র খুলিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে ভ্রমর বিরলে বসিয়া নয়নের সহস্রধারা মুছিতে-মুছিতে সেই পত্র পড়িলেন। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িলেন। সেদিন ভ্রমর আর দ্বার খুলিলেন না। যাহারা আহারের জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিল, তাহাদিগকে বলিলেন, "আমার জ্বর হইয়াছে—আহার করিব না।" ভ্রমরের সর্ব্বদা জ্বর হয়; সকলে বিশ্বাস করিল।

পরদিন নিদ্রাশূন্য-শয্যা হইতে উঠিয়া ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিলেন, লিখিলেন, "আপনার পত্র পাইয়াছি। বিষয় আপনার। আপনি নির্ব্বিঘ্নে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া আপনার সম্পত্তি দখল করিতে পারেন। আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার বাড়ী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব, আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট,—আপনিও যে সন্তুষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম।"

যথাকালে পত্র গোবিন্দলালের হস্তগত হইল। কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু কোমলতাও নাই। গোবিন্দলালও লিখিয়াছেন ছয় বৎসরের পর লিখিতেছি, কিন্তু ভ্রমরের পত্রে সে-রকমের কথাও একটা নাই। সেই ভ্রমর!

গোবিন্দলাল পত্র পড়িয়া উত্তর লিখিলেন, "আমি হরিদ্রাগ্রামে যাইব না। যাহাতে আমার দিনপাত হয়, এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এখানে পাঠাইয়া দিও।"

ভ্রমর উত্তর করিলেন, "মাস-মাস আপনাকে পাঁচশত টাকা পাঠাইব। আরও অধিক পাঠাইতে পারি, কিন্তু অধিক টাকা পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা। আর আমার একটি নিবেদন, বৎসর-বৎসর যে উপস্বত্ব জমিতেছে—আপনি এখানে আসিয়া ভোগ করিলে ভালো হয়। আমার জন্য দেশত্যাগ করিবেন না—আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।"

গোবিন্দলাল কলিকাতাতেই রহিলেন। উভয়েই বুঝিলেন, সেই ভালো।

———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সপ্তম বৎসর

ভ্রমরের পীড়ার উপশম হইল না। যত দিন যাইতে লাগিল, অন্তিম কাল দিনে-দিনে যত নিকট হইতে লাগিল, ভ্রমর তত স্থির, প্রফুল্ল, হাস্যমূর্ত্তি। শেষে সেই ভয়ঙ্কর শেষ দিন উপস্থিত হইল। ভ্রমর পৌরজনের চাঞ্চল্য এবং যামিনীর কান্না দেখিয়া বুঝিলেন, আজ বুঝি দিন ফুরাইল। শরীরে যন্ত্রণাও সেইরূপ অনুভূত করিলেন। তখন ভ্রমর যামিনীকে বলিলেন—"আজ শেষ দিন।"

যামিনী কাঁদিলেন। ভ্রমর বলিলেন, "দিদি—আজ শেষ দিন। আমার কিছু ভিক্ষা আছে—কথা রাখিও।"

যামিনী কাঁদিতে লাগিলেন—কথা কহিলেন না।

ভ্রমর বলিলেন, "আমার এক ভিক্ষা, আজি কাঁদিও না—আমি মরিলে পর কাঁদিও—আমি বারণ করিতে আসিব না—কিন্তু আজ তোমাদের সঙ্গে যে কয়টা কথা কহিতে পারি, নির্ব্বিঘ্নে কহিয়া মরিব, সাধ করিতেছে।"

যামিনী আর কতক্ষণ কান্না রাখিবেন?

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল। ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, রাত্রি কি—জ্যোৎস্না?"

যামিনী জানালা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।"

ভ্র। তবে জানালাগুলি সব খুলিয়া দাও—আমি জ্যোৎস্না দেখিয়া মরি। দেখি, ঐ জানালার নীচে যে ফুলবাগান, উহাতে ফুল ফুটিয়াছে কি না?

যামিনী জানালা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "কই, এখানে তো ফুল-বাগান নাই—কেবল খড়-বন—আর দুই-একটা মরা গাছ আছে—তাহাতে ফুল-পাতা কিছুই নাই।"

ভ্রমর। সাত বৎসর হইল, ওখানে ফুল-বাগান ছিল। বে-মেরামতে গিয়াছে। আমি সাত বৎসর দেখি নাই।

অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, "যেখান হইতে পারো দিদি, আজ আমায় ফুল আনাইয়া দিতে হইবে। দেখিতেছ না, আজ আবার আমার ফুলশয্যা?"

যামিনীর আজ্ঞা পাইয়া দাস-দাসী রাশীকৃত ফুল আনিয়া দিল। ভ্রমর বলিলেন, "ফুল আমার বিছানায় ছড়াইয়া দাও।"

যামিনী তাহাই করিলেন, তখন ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। যামিনী বলিলেন, "কাঁদিতেছ কেন দিদি?"

ভ্রমর বলিলেন, "দিদি, একটি বড় দুঃখ রহিল। যেদিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, সেইদিন যোড়হাতে কাঁদিতে-কাঁদিতে দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, একদিন যেন তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম, 'আমি যদি সতী হই, তবে আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হইবে।' কই আর তো দেখা হইল না। দেখা হইলে—মরিবার দিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম।"

যামিনী বলিলেন, "দেখিবে?" ভ্রমর যেন বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিলেন; বলিলেন—"কার কথা বলিতেছ?"

যামিনী বলিলেন, "গোবিন্দলালের কথা। তিনি এখানে আছেন—বাবা তোমার পীড়ার সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। শুনিয়া তোমাকে

দেখিবার জন্য তিনি আজ আসিয়াছেন, তোমার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে পারি নাই—তিনিও সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই।"

ভ্রমর কাঁদিয়া বলিলেন, "একবার দেখা দিদি, ইহজন্মে আর-একবার দেখি। এই সময়ে আর-একবার দেখা।"

যামিনী উঠিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল সাত বৎসরের পর নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ভ্রমর স্বামীকে কাছে আসিয়া বিছানায় বসিতে ইঙ্গিত করিলেন—গোবিন্দলাল কাঁদিতে-কাঁদিতে বিছানায় বসিলেন। ভ্রমর তাঁহাকে আরও কাছে আসিতে বলিলেন,—গোবিন্দলাল আরও কাছে গেলেন। তখন ভ্রমর আপনার করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু মাথায় দিলেন; বলিলেন, "আজ আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

গোবিন্দলাল কোনো কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাত রহিল। অনেকক্ষণ রহিল। ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর মরিয়া গেলেন। যথারীতি তাঁহার সৎকার হইল। সৎকার করিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল গৃহে বসিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবধি তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন নাই।

পরদিন গোবিন্দলালের বহু কষ্টে কাটিল।

গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া ভ্রমরের শয্যাগৃহতলস্থ সেই পুষ্পোদ্যানে গেলেন। যামিনী যথার্থই বলিয়াছেন, সেখানে আর পুষ্পোদ্যান নাই। সকলই ঘাস, খড় ও জঙ্গলে পুরিয়া গিয়াছে। দুই-একটি অমর পুষ্পবৃক্ষ সেই জঙ্গলের মধ্যে অর্দ্ধমৃতবৎ আছে,—কিন্তু তাহাতে আর ফুল ফুটেনা। গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেই খড়বনের মধ্যে বেড়াইলেন। অনেক বেলা হইল, রৌদ্রের অত্যন্ত তেজঃ হইল —গোবিন্দলাল বেড়াইয়া-বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া নিস্ক্রান্ত হইলেন।

তথা হইতে গোবিন্দলাল কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া, কাহারও মুখপানে না চাহিয়া, বারুণী-পুষ্করিণীর তটে গেলেন। বেলা দেড় প্রহর হইয়াছে। তীব্র রৌদ্রের তেজে বারুণীর গভীর কৃষ্ণোজ্জ্বল বারিরাশি জ্বলিতেছিল। স্ত্রী পুরুষ বহুসংখ্যক লোক ঘাটে স্নান করিতেছিল—ছেলেরা কালো-জলে স্ফটিক চূর্ণ করিতে-করিতে সাঁতার দিতেছিল। গোবিন্দলালের তত লোকসমাগম ভালো লাগিল না। ঘাট হইতে যেখানে বারুণীতীরে তাঁহার সেই নানাপুষ্পরঞ্জিত নন্দন-তুল্য পুষ্পোদ্যান ছিল, গোবিন্দলাল সেইদিকে গেলেন। প্রথমেই দেখিলেন, রেলিং ভাঙিয়া গিয়াছে—সেই লৌহ-নির্ম্মিত বিচিত্র দ্বারের

পরিবর্ত্তে—কঞ্চির বেড়া। ভ্রমর গোবিন্দলালের জন্য সকল সম্পত্তি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ উদ্যানের প্রতি কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই। একদিন যামিনী সে বাগানের কথা বলিয়াছিলেন। ভ্রমর বলিয়াছিলেন, "আমি যমের বাড়ী চলিলাম—আমার সে নন্দনকানন ধ্বংস হউক। দিদি, পৃথিবীতে যা আমার স্বর্গ ছিল—তা আর কাহাকে দিয়া যাইব ?"

গোবিন্দলাল দেখিলেন, ফটক আর নাই—রেলিং পড়িয়া গিয়াছে। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ফুলগাছ নাই—কেবল উলুবন, কচুগাছ, ঘেঁটুফুলের গাছ আর কালকাসান্দা গাছে বাগান পরিপূর্ণ। লতা-মণ্ডপসকল ভাঙিয়া পড়িয়া গিয়াছে—প্রস্তর-মূর্ত্তিসকল দুই-তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে, তাহার উপর লতাসকল ব্যাপিয়াছে, কোনটা-বা ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। প্রমোদ-ভবনের ছাদ ভাঙিয়া লইয়া গিয়াছে—ঝিলিমিলি সার্শি কে ভাঙিয়া লইয়া গিয়াছে। মর্ম্মরপ্রস্তরসকল কে হর্ম্ম্যতল হইতে খুলিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। সে বাগানে আর ফুল ফুটেনা, ফল ফলেনা—বুঝি সুবাতাসও আর বয়না।

একটা ভগ্ন-প্রস্তরমূর্ত্তির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল, গোবিন্দলাল সেইখানে বসিয়া রহিলেন। প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজে তাঁহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুই অনুভব করিলেন না। তাঁহার প্রাণ যায়! রাত্রি অবধি কেবল ভ্রমর ও রোহিণী ভাবিতেছিলেন। একবার ভ্রমর, তারপর রোহিণী, আবার ভ্রমর, আবার রোহিণী। ভাবিতে-ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে রোহিণীকে দেখিতে

লাগিলেন—জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইয়া উঠিল। সেই উদ্যানে বসিয়া প্রত্যেক বৃক্ষকে ভ্রমর বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল—প্রত্যেক বৃক্ষচ্ছায়ায় রোহিণী বসিয়া আছে দেখিতে লাগিলেন। এই ভ্রমর দাঁড়াইয়াছিল —আর নাই—এই রোহিণী আসিল, আবার কোথায় গেল? প্রতি শব্দে ভ্রমর বা রোহিণীর কণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। ঘাটে স্নানকারীরা কথা কহিতেছে, তাহাতে কখনও বোধ হইল, ভ্রমর কথা কহিতেছে, কখনও বোধ হইতে লাগিল, রোহিণী কথা কহিতেছে—কখনও বোধ হইল, তাহারা দুইজনে কথোপকথন করিতেছে। শুষ্ক পত্র নড়িতেছে—বোধ হইল, ভ্রমর আসিতেছে। বনমধ্যে বন্য কীট-পতঙ্গ নড়িতেছে,—বোধ হইল, রোহিণী পলাইতেছে। বাতাসে শাখা দুলিতেছে,—বোধ হইল, ভ্রমর নিশ্বাসত্যাগ করিতেছে —দয়েল ডাকিলে বোধ হইল, রোহিণী গান করিতেছে। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইল।

বেলা দুই প্রহর—আড়াই প্রহর হইল—গোবিন্দলাল সেইখানে —সেই ভগ্নপুত্তলপদতলে—সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে। বেলা তিন প্রহর, সার্দ্ধ তিন প্রহর হইল—অস্নাত অনাহারী গোবিন্দলাল সেইখানে, সেই ভ্রমর-রোহিণীময় অনলকুণ্ডে। সন্ধ্যা হইল, তথাপি গোবিন্দলালের উত্থান নাই···চৈতন্য নাই। তাঁহার পৌরজন তাঁহাকে সমস্ত দিন না দেখিয়া মনে করিয়াছিল, তিনি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অধিক সন্ধান করে নাই। সেইখানে সন্ধ্যা হইল। কাননে অন্ধকার হইল। আকাশে নক্ষত্র ফুটিল। পৃথিবী নীরব হইল। গোবিন্দলাল সেইখানে।

অকস্মাৎ সেই অন্ধকার, স্তব্ধ বিজনমধ্যে গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্ত

চিত্ত বিষম বিকারপ্রাপ্ত হইল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে রোহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিতে লাগিলেন। রোহিণী উচ্চৈঃস্বরে যেন বলিতেছে—

"এইখানে"

গোবিন্দলালের তখন আর স্মরণ ছিল না যে, রোহিণী মরিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইখানে—কি ?"

যেন শুনিলেন, রোহিণী বলিতেছে—

"এমনি সময়ে"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "এইখানে, এমনি সময়ে কি রোহিণী ?"

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলাল শুনিলেন, আবার রোহিণী উত্তর করিল—

"এইখানে, এমনি সময়ে, ঐ জলে,

আমি ডুবিয়াছিলাম'

গোবিন্দলাল, আপন মানসোদ্ভূত এই বাণী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি ডুবিব ?"

আবার ব্যাধিজনিত উত্তর শুনিতে পাইলেন, "হাঁ, আইস। ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইতেছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদিগের উদ্ধার করিবে।—

"প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।"

গোবিন্দলাল চক্ষু বুজিলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ন বেপমান হইল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া সোপান-শিলার উপরে পতিত হইলেন।

মুগ্ধাবস্থায় মানসচক্ষে দেখিলেন, সহসা রোহিণীমূর্ত্তি মিলাইয়া গেল। তখন দিগন্ত ক্রমশঃ প্রভাসিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি সম্মুখে উদিত হইল।

ভ্রমরমূর্ত্তি বলিল, "মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।"

গোবিন্দলাল সে-রাত্রে মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন। প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাঁহার লোকজন তাঁহাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। দুই-তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন যে, তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না। এক রাত্রি তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কেহ আর তাঁহার কোনো সংবাদ পাইল না।

সাত বৎসরের পর তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল।

পরিশিষ্ট

গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাঁহার ভাগিনেয় শচীকান্ত প্রাপ্ত হইল! শচীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত।

শচীকান্ত সেই দুঃখময় কাহিনী সবিস্তারে শুনিয়াছিল। সে নূতন করিয়া পূর্ব্বের মত আবার প্রমোদোদ্যান প্রস্তুত করাইল। প্রমোদ-ভবনের পরিবর্ত্তে একটি মন্দির প্রস্তুত করিল। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ভ্রমরের একটি প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া সেই মন্দির-মধ্যে স্থাপন করিল। স্বর্ণ-প্রতিমার পদতলে অক্ষর ক্ষোদিত করিয়া লিখিল:

"যে সুখে দুঃখে দোষে গুণে ভ্রমরের সমান হইবে, আমি তাহাকে এই স্বর্ণ-প্রতিমা দান করিব।"

ভ্রমরের মৃত্যুর বারো বৎসর পরে সেই মন্দিরদ্বারে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। শচীকান্ত সেইখানেই ছিল। সন্ন্যাসী তাহাকে বলিল, "এই মন্দিরে কি আছে, দেখিব।"

শচীকান্ত দ্বার মোচন করিয়া সুবর্ণময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি দেখাইল। সন্ন্যাসী বলিল, "এই ভ্রমর আমার ছিল। আমি গোবিন্দলাল রায়।"

শচীকান্ত বিস্মিত, স্তম্ভিত হইল। তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু পরে বিস্ময় দূর হইল, সে গোবিন্দলালের পদধূলি গ্রহণ করিল; পরে তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য যত্ন করিল। গোবিন্দলাল অস্বীকৃত

হইলেন। বলিলেন, "আজ আমার দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইল। অজ্ঞাতবাস সমাপনপূর্ব্বক তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করা হইল। এখন ফিরিয়া যাইব।"

শচীকান্ত যুক্তকরে বলিল, "বিষয় আপনার, আপনি উপভোগ করুন।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "বিষয়-সম্পত্তি অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে আমার কাজ নাই, তুমিই উহা ভোগ করিতে থাকো।"

শচীকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়?"

গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, "কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎপাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না।

সমাপ্ত

প্রহেলিকা সিরিজ

● প্রত্যেকখানি এক টাকা

ছোটদের জন্য ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

১। মুখোসের অন্তরালে	২। মৃত্যুদূত	৩। ব্লাড হাউণ্ড
৪। কালের কবলে	৫। শেষ বলি	৬। নৈশ অভিযান
৭। কবরের নীচে	৮। জীবনের মেয়াদ	৯। অস্তাচলের পথে
১০। শেষ নিঃশ্বাস	১১। দরদী বন্ধু	১২। রাতের অতিথি
১৩। মিঃ গপ্প ডিটেক্‌টিভ	১৪। কাল-বৈশাখী ঝড়	১৫। দেশের ডাক
১৬। রাত যখন সাতটা	১৭। ঝড়ের প্রদীপ	১৮। ডাকাত-কালীর জঙ্গলে
১৯। স্বপ্ন হলো সত্যি	২০। অদৃশ্য গোয়েন্দা	২১। গ্রহের ফের
২২। হাওয়ার পেছনে	২৩। রক্ত-তৃষা	২৪। নকলের হিমালয়
২৫। বি, এল, এ—২০৫	২৬। জয়-পরাজয়	২৭। পূজনীয় দস্যু
২৮। দুর্য্যোগের রাতে	২৯। সবই যখন অন্ধকার	৩০। কলঙ্কী চাঁদ
৩১। বর্ম্মা ফেরত	৩২। সোনার খনি	৩৩। জলটুঙ্গী
৩৪। অপরাধের কারখানা	৩৫। লাল-দলিল	৩৬। পেশোয়ারের বিভীষিকা
৩৭। অভিশপ্ত বংশ	৩৮। শার্লক হোমসের কথা	৩৯। ব্যথার দান
৪০। মায়ের ডাক	৪১। আলেয়ার আলো	৪২। লক্ষ টাকার হীরা
৪৩। প্রাণ নিয়ে খেলা	৪৪। বাসুকির অভিশাপ	৪৫। ছায়া ও কায়া
৪৬। আবার রবিনহুড	৪৭। নিয়তির দূত	৪৮। বর্ম্মার অভিশাপ

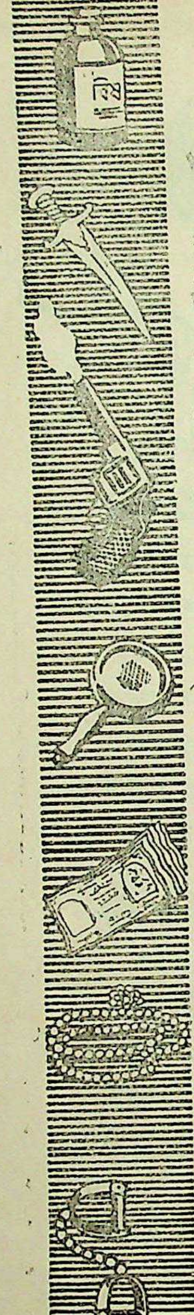

= কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ =

(ডিটেক্‌টিভ কাহিনী-পূর্ণ শিশু-উপন্যাস)

প্রত্যেকখানি—এক টাকা

১। অন্ধকারের বন্ধু
২। ছিন্নমস্তার মন্দির
৩। তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক
৪। বিজয়-অভিযান
৫। ছায়া কালো-কালো
৬। রাত্রির যাত্রী
৭। হারাণো বই
৮। জীবন্ত-সমাধি
৯। গুপ্তঘাতক
১০। মিস্‌মিদের কবচ
১১। উদাসীবাবার আখড়া
১২। কেউটের ছোবল
১৩। হত্যার প্রতিশোধ
১৪। মুখ আর মুখোস
১৫। নীল আলো
১৬। ভূতের মত অদ্ভুত
১৭। রাতের আতঙ্ক
১৮। ঘোরপ্যাঁচ
১৯। বিভীষণের জাগরণ
২০। নিঝুম রাতের কান্না
২১। অভিশপ্ত ম্যমি
২২। স্বর্গের সিঁড়ি
২৩। ওপারের দূত
২৪। জয়পতাকা

যুবক-যুবতীদের জন্য ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

= অনুপমা-সিরিজ =

১। নীল চোখের সংকেত—১॥০
২। উল্কার আলো—১॥০
৩। গহন বনের ছায়া—১॥০
৪। মনভোলান বাঁশী—১॥০
৫। কাজলগড়ের কাহিনী—১॥০

যুবক-যুবতীদের জন্য

সুখপাঠ্য ডিটেক্‌টিভ গ্রন্থাবলী

পিরামিড্ সিরিজ

'কাঞ্চনজঙ্ঘা-সিরিজ' ও 'প্রহেলিকা-সিরিজ' নামে আমরা এতদিন কেবল ছোটদের জন্য ডিটেক্‌টিভ্ বই প্রকাশ করে আসছিলাম। তাই সারা বাংলার যুবক-যুবতীগণ তাঁদের দাবী জানিয়ে বহু চিঠি দিয়েছেন আমাদের।

বড়দের জন্যও ডিটেক্‌টিভ্ বই চাই।

তাঁদের দাবী আমাদের কাছে অগ্রগণ্য—তাই

ইংলণ্ডের বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ্

মিঃ পিটার ও তাঁর সুযোগ্য সহকারী মাষ্টার পল্

মৃত্যু বরণ করেও যে সকল দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছে যুবক-যুবতীদের জন্য এই **পিরামিড্ সিরিজ**।

১। চতুর্থ জার্ম্মান	১০। বেডফোর্ড মার্ডার কেস	১৯। সিলভার ড্রাগন
২। ডেঞ্জার সিগন্যাল	১১। ফাদার এণ্ড সন্	২০। সিক্রেট সেভ
৩। মিড্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক মিষ্ট্রী	১২। টুইন্ ব্রাদার্স	২১। ডেস্‌পারেট্ লেডি
৪। ষ্ট্রেঞ্জ উওম্যান	১৩। গ্রীন্ হাউস্	২২। টু-মেনি মার্ডাস্
৫। রেডিও-ক্যামেরা	১৪। রুম-নম্বর থার্টি	২৩। ডায়মণ্ড মাইন্‌স্
৬। ডার্ক-রুম	১৫। ওয়ার ক্রিমিন্যাল	২৪। অফিস মার্ডার
৭। মিষ্টিরিয়াস্ ষ্টেজ	১৬। বার্মিজ মিষ্ট্রী	২৫। জাঙ্গল উওম্যান্
৮। ইয়ং ফটোগ্রাফার	১৭। লস্ট প্যারাশুট্	২৬। পার্টনার্স ইন্ ক্রাইম
৯। ডিভোর্‌স্‌ড্ ওয়াইফ	১৮। টাইগার-ম্যান্	

প্রত্যেকখানির মূল্য—১৷৷০

কল্যাণীয়া— কলিকাতা

কুমারী সন্ধ্যা, অনুভা ও মলিনা !

তোমাদের অভিযোগ মিথ্যা নয়, শুধু ছেলেদের ছাড়া মেয়েদের 'য়্যাড্‌ভেঞ্চারের বই' এ পর্য্যন্ত কেউ লেখেন নি। এই কারণেই 'কৃষ্ণা সিরিজ' ও 'কুমারিকা সিরিজে'র আবির্ভাব।

কোন আকস্মিক বিপদ এলে মেয়েদের যা করা প্রয়োজন, এই সিরিজ পড়লেই তার ইঙ্গিত পেয়ে যাবে। এই সিরিজের বই প্রতি মাসে একখানি ক'রে বার হচ্ছে। আশা করি, প্রত্যেকখানি বই তোমাদের ভাল লাগবে। যদি কোন বই ভাল না লাগে, তাহলে জানাতে দ্বিধা বোধ ক'রো না।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী'র

=কুমারিকা সিরিজ=

১। অগ্নিশিখা—৸৹
২। শিখার সাধনা—৸৹
৩। বিজয়িনী শিখা—৸৹
৪। শিখা ও সবিতা—৸৹
৫। রহস্যময়ী শিখা—৸৹
৬। দুর্গম পথে শিখা—৸৹
৭। শিখার আবিষ্কার—৸৹
৮। শিখার কালরাত্রি—৸৹
৯। শিখার ছদ্মবেশ—৸৹
১০। শিখার অগ্নিপরীক্ষা—৸৹
১১। শিখা ও রাজকন্যা—৸৹
১২। শিখার স্বপ্ন—৸৹

=কৃষ্ণা সিরিজ=

[মেয়েদের জন্য ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস]

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী রচিত

১। কারাগারে কৃষ্ণা—১৷৹
২। মায়াবী ও কৃষ্ণা—১৷৹
৩। কৃষ্ণার অভিযান—১৷৹
৪। কৃষ্ণার পরিচয়—১৷৹
৫। বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা—১৷৹
৬। মুক্তিপথে কৃষ্ণা—১৷৹
৭। কৃষ্ণার জয়যাত্রা—১৷৹

=হেমেন্দ্রলাল রায়=

গল্পের মায়াপুরী

সত্যিকারের

মায়াপুরীর

মতই

গল্পের মায়াপুরীতেও রহস্যের অন্ত নেই। তোমরা পড়তে পড়তে কখনো হাসবে, কখনো কাঁদবে, কখনো বিস্ময়ের দোলায় দুলবে, আবার কখনো ভয়ে চোখ বন্ধ করে থাকবে ...দাম—২৲ টাকা

=বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য=

= বিশ্বের বিস্ময় =

অবাক হয়ে শোনবার মত বহু বিষয় এতে আছে, আর আছে অসংখ্য ছবি......

দাম ১৲ টাকা

জন্মদিনের উপহার

এতে আছে—

হাসির রাজা **"শিবরামের"** আঠারোটি বাছাই-করা হাসির গল্প।

দাম—২৲ টাকা

শিবরামের আর একখানা হাসির বই **উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।**

দাম—১৲ টাকা

=যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়=

দৌলৎখানা

কে বলে বাঙ্গালী ভীরু? সাহসে ও বীরত্বে তাঁরা যে-কোন জাতিকে হঠাতে পারেন। দুর্দ্দান্ত দস্যু-সর্দ্দার নির্ম্মম পিশাচ রতন বাওলার অত্যাচারে জর্জ্জরিত বিপন্নের উদ্ধার ও তার আজন্ম-সঞ্চিত দৌলৎ আনতে গিয়ে বাঙ্গালীর ছেলে বিজয় কত বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে গেছে, মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত কি ভাবে ছিনিমিনি খেলেছে, দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হবেন। দাম—১৲

=চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী=

= দুনিয়ার আজব =

পৃথিবীতে যত কিছু অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্য জিনিষ আছে, তার সব কিছুই পাবেন এই বই-এ—সেই সঙ্গে পাবেন তাদের ছবি। দাম—১৲

=রমেশচন্দ্র দাশ=

অজ্ঞাত দেশ

বাঙ্গালীর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বিচিত্র কাহিনী…

দাম—১৷৹

=ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী=

আকাশ-গঙ্গা

হিমালয়ের গঙ্গোত্রী থেকে আরম্ভ করে কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম, হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, কামাখ্যা, সাগর-সঙ্গম প্রভৃতি বহু তীর্থস্থানের চমকপ্রদ কাহিনী…গল্পের চেয়েও অদ্ভুত। তীর্থগুলির বড় বড় ফটো এর সৌন্দর্য্য শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে দাম—১৷৹ টাকা

=যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত=

অজানা দেশে

অজানা দেশের চমকপ্রদ কাহিনী…

দাম—১৲

=সুবিনয় রায়চৌধুরী=

জীবজগতের আজব কথা

নানারকম দুষ্প্রাপ্য জীবজন্তুর আজব কথা, কোন্ দেশে কোন্ জন্তু পাওয়া যায়, পশু-পক্ষীদের পোষাকের বৈচিত্র্য, ইহাদের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ইত্যাদি বহু নূতন তথ্যে এই পুস্তকখানি সমৃদ্ধ। অসংখ্য রঙ্গিন ছবি। দাম—১৷৹ টাকা

=জনশিক্ষা গ্রন্থমালা=

[প্রত্যেকখানি দশ আনা]

১। মহাভারতীয় গল্প	২। পুরাণের গল্প	৩। পল্লীগীতি কাব্যকথা
৪। জাতকের গল্প	৫। উপনিষদের গল্প	৬। ভাগবতের গল্প
৭। ভারত-নারী	৮। মঙ্গল কাব্যের গল্প	৯। জ্ঞান ও কর্ম্মে বাঙ্গালী
১০। সাহিত্যে বাঙ্গালী	১১। রামায়ণী কথা	১২। ধর্ম্মে বাঙ্গালী
১৩। দেশপ্রেমে ভারতবাসী	১৪। দেবীযুদ্ধের কাহিনী	১৫। ভক্ত জীবন-কাহিনী

দেব সাহিত্য-কুটীর সম্পাদিত

ঠাকুরমার ঝুলি

প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ :: দাম—৩৲ টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত ও দামোদর গ্রন্থমালা

=বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থমালা=

[প্রত্যেকখানি—এক টাকা]

১। আনন্দমঠ ২। দেবী চৌধুরাণী ৩। কপালকুণ্ডলা ৪। বিষবৃক্ষ
৫। চন্দ্রশেখর ৬। দুর্গেশনন্দিনী ৭। কৃষ্ণকান্তের উইল ৮। রজনী
৯। রাজসিংহ ১০। সীতারাম ১১। রাধারাণী ও ইন্দিরা
১২। যুগলাঙ্গুরীয় ১৩। মৃণালিনী ১৪। কমলাকান্তের দপ্তর
১৫। রাজমোহনের বউ (উপন্যাস)—২৲

=রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থমালা=

১। মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত ১৲ ৩। বঙ্গবিজেতা ১৲ ৫। সংসার ২৲
২। রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা ১৲ ৪। মাধবী কঙ্কণ ১৲ ৬। সমাজ ২৲

=দামোদর গ্রন্থমালা=

১। মৃন্ময়ী ১৲ ২। তিলোত্তমা ১৲ ৩। নবাব-নন্দিনী ১৲ ৪। মা ও মেয়ে ২৲
৫। সোনার কমল—২৲ ৬। শুক্লবসনা সুন্দরী—৩৲

=সঞ্জীবচন্দ্র গ্রন্থমালা=

১। মাধবীলতা (উপন্যাস) ২৲ ২। কণ্ঠমালা (উপন্যাস) ২৲

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
স্বর্ণলতা—২৲

ত্রৈলোক্যনাথের
কঙ্কাবতী—২৲

=হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা=

সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন

নীল-সাগরের সুদূর পারে আছে আমেরিকার বিরাট হিমালয় এবং তারই কোলে লুকিয়ে আছে সূর্য্যনগরীর গুপ্ত রহস্য।

সেখানে বনে বনে রাজত্ব করে মানুষ-খেকো বাঘ, বিরাটকায় অজগর আর র‍্যাট্‌ল্ সাপ। ঘোড়া ছুটিয়ে পাহারা দেয় মাথায় পালক-পরা বন্য লাল মানুষের দল,…পূজো করে তারা অদ্ভুত সব দেবতাকে, নরবলি দেয়—হয়ত এখনো মানুষের মাংস খায়। বিপদের সেই বেড়াজালের মধ্যে আছে না জানি কত বৈচিত্র্যের রোমাঞ্চ, কত ঘটনার পর ঘটনার বিভীষিকা। পড়তে পড়তে গা শিউরে উঠবে। অবাক বিস্ময়ে শুধু ভাবতে হবে পৃথিবীর বুকে এখনো লুকিয়ে আছে কতো অজানা রহস্য!

দাম—১।০

=হেমেন্দ্রকুমার রায়=

অমানুষিক মানুষ

একখানি ভয়াবহ অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বই। যা পড়ে তোমরা হাসবে, কাঁদবে আবার ভয়ে শিউরে উঠবে। বিচিত্র ছবি… দাম—১।০

=হেমেন্দ্রকুমার রায়=

আধুনিক রবিনহুড

বিভিন্ন দেশের ডাকাতদের রোমাঞ্চকর কাহিনী। দাম ১৲ টাকা

=খগেন্দ্রনাথ মিত্র=

তাতারের বন্দী

একখানি সেই শ্রেণীর বই, যা হাতে পেলে এক নিঃশ্বাসে শেষ না করে পারা যায় না। ঘটনাগুলি যেমনি ভয়াবহ, তেমনি অদ্ভুত। দাম—১।০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

আলো দিয়ে গেল যারা

ইতিহাসের সমুদ্র মন্থন করিয়া

বিখ্যাত কথাশিল্পী তাঁহার সুললিত প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থে দশটি ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন

উপন্যাসের মতই মনোহর!

● **উৎকৃষ্ট মসৃণ কাগজে চক্‌চকে ছাপা, অজস্র এক-রঙা ও বহু-রঙা ছবি, ঝক্‌ঝকে বাঁধাই—রাজসংস্করণ—মূল্য ২৲ টাকা**

= টার্জান সিরিজ =

টার্জান দি এপম্যান— ১৷০

অ্যাড্‌ভেঞ্চার অব টার্জান— ১৲

টার্জান এণ্ড হিজ মেট্‌— ১৲

টার্জান এণ্ড দি ট্রেইটর— ১৷০

টার্জান ইন দি জাঙ্গল— ১৷০

টার্জান দি গ্রেট— ১৷০

বনমানুষীর স্নেহে লালিত মানবসন্তান **টার্জান** ও সভ্যসমাজের শিক্ষিতা ইংরেজ-কুমারী বার্থার কাহিনী…… **হিংস্র টার্জান**—যার চীৎকারে বনের সিংহ-ব্যাঘ্রও আঁৎকে ওঠে,—সেই টার্জানের রোমাঞ্চকর কাহিনী—টার্জান আবার মানুষ হ'লো…কী…ভাবে হ'লো……কে তাকে মানুষ করলো… অরণ্যের বিভীষিকা,…বন্য হিংস্র মানব-সন্তানের জিঘাংসা…মনস্তত্ত্বের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ……রোমহর্ষণ কাহিনী…সব মিলিয়ে একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা… ?

=সুনির্ম্মল বসু=

মরণের ডাক

ভীষণ চীনা দস্যু…যার হাতে পড়ে কত নিরীহ প্রাণীর এসেছে মরণের ডাক…কিন্তু বাঙ্গালী বীরের কাছে তাকেও একদিন হার মানতে হয়েছিল। সে এক চমকপ্রদ কাহিনী…

দাম—১৷০

=হেমেন্দ্রকুমার রায়=

দেড়-শো খোকার কাণ্ড

ঠিক তোমাদেরই মত দেড়-শো খোকা মিলে কলকতা মহানগরীর বুকে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, তা যেমন অদ্ভুত তেমনি ভয়াবহ।

পড়তে-পড়তে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাবে। সুন্দর সুন্দর ছবি… ১৲

রহস্যের মায়াজাল

রহস্যের মায়াজালে অমল আর বাহাদুরের বাহাদুরীর কথা পড়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে মুগ্ধ হতে হবে। প্রতি পদে

বিপদ—ভয়—বিস্ময় ও উত্তেজনা।

দাম ১৲ টাকা

=সুবোধচন্দ্র মজুমদার=

বোম্বেটে দ্বীপ

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে কাকোয়া দ্বীপ—যেখানে গেলে কাউকেই আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হয় না; সেখানকার বোম্বেটেদের হাতে বন্দী রমেশবাবুকে উদ্ধার করতে যাত্রা করেছে তপন, রজত ও বিনয়…তারপর? এই দুঃসাহসিক অভিযানের পরিণাম?…দাম ১৲ টাকা

=যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়=

কম্যাণ্ডার কবুতর

কবুতর আবার কম্যাণ্ডার? শুধু তাই নয়, গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মান পক্ষীয় কম্যাণ্ডার!

তারই অপূর্ব ভ্রমণ-কাহিনী। সুন্দর সুন্দর ছবি… দাম ১৷৹ টাকা

বীরেন দাশের লেখা ও ছায়াচিত্রে অভিনীত

মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন, বৃহস্পতিবার পলাশী-প্রাঙ্গণে বিশ্বাস-ঘাতকদের চক্রান্তে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতা ইংরাজ বণিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদানত হলো।……সেই কলঙ্কিত ইতিহাসের পাতা জুড়ে এই জীবন-মহা-নাটকের সূচনা।

প্রায় ২০০ পাতার বই

দাম—২৲

=শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য=

সমুদ্রের রহস্য

সমুদ্র-রাজ্যের নানা বিচিত্র খবর। কত রকম জীব …কত অদ্ভুত তার ইতিহাস…অসংখ্য ছবি।

দাম—১৷৹

হানাবাড়ী

দাম—১৷৹

=সুবোধচন্দ্র মজুমদার=

হিমালয়ের বুকে

হিমালয়ের চিররহস্য ভেদ করতে এগিয়ে চলেছে চারটি প্রাণী…তাঁদের সে রোমাঞ্চকর অভিযান সত্যই অতুলনীয়। ছবি, ছাপা চমৎকার…

দাম—১৲

নরখাদক

দাম—১৲

=স্ত্রীভূমিকা-বর্জ্জিত শিশু-নাটক=

বুড়িবালামের তীরে (সুধীন রাহা) ১৲ সিপাহী বিদ্রোহ (বঙ্কিম ঘোষ) ১৲
কেদার রায় (দীপনারায়ণ মুখোঃ) ৷৶০ জাগোরে ধীরে (বিধায়ক ভট্টাচার্য্য) ৷৶০
বন্দীবীর (সুনির্ম্মল বসু) ৷৶০ যুগাবতার রামকৃষ্ণ (ঐ) ৷০
গুরুদক্ষিণা (প্রভাসচন্দ্র ঘোষ) ৷০ বাংলার বিবেক (ঐ) ৷৶০

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

স্বাধীনতা জাগলো ৷০ কুশধ্বজ ৷০ বিদ্রোহী ৷০

উৎসব (গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়) ৷৶০ বীর মোহনলাল (সুধীন রাহা) ৷৶০
মুক্তিপথে (ঐ) ৷০ বীর শিবাজী (ঐ) ৷৶০

কেশবচন্দ্র সেন প্রণীত

চন্দ্রগুপ্ত ৷০ কর্ণার্জ্জুন ৷৶০ বিজয় সিংহ ৷৶০

বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত

সিরাজের স্বপ্ন ৷৶০ প্রতাপ সিংহ ৷৶০

=পুরুষভূমিকা-বর্জ্জিত=

=মেয়েদের নাটক=

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ঝান্সীর রাণী ৷৶০ মাটির ঘর ৷৶০

স্বপন বুড়ো প্রণীত

বাণী—৷৶০ শিশুনাটিকা—৷৶০ (ছেলেমেয়েদের জন্য)

ভূত-পেত্নী দত্যি-দানা

অসংখ্য চিত্র-সংবলিত...দাম—৩৲

শুকতারা
শিশু-মাসিক

প্রতি সংখ্যা—৷৶০ বার্ষিক মূল্য—৪৲
নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

পূজোর উপহার
অনেক দিনের অনেক কথা
দাম ২টাকা
•দেব সাহিত্য কুটীর • কলিকাতা-৯•

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
অনেক দিনের অনেক কথা--২৲

প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হয়, সূর্য্য কিন্তু পুরাণো হয় না...
তেমনি সাহিত্যে যা সুন্দর তা কোনদিনই পুরাণো হয় না
সেই কথা স্মরণ করে, কিশোর-কিশোরীদের বিশেষ অনুরোধে

ছোটদের মাধুকরী

নব-সংস্করণে প্রকাশ করেছি

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশের প্রত্যেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকের এমন সব রচনা এতে আছে, যা আজকের দিনের কিশোর-কিশোরীদের কাছে অমূল্য সম্পদ্। দাম—৩৲ টাকা।

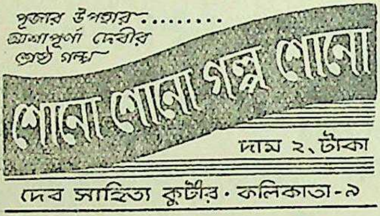

রাধারাণী দেবীর

গল্পের আলপনা

দাম ২৲ টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯

=পূজা-বার্ষিকী=

১। **ছোটদের চয়নিকা—৩৲** ২। **ছোটদের গল্প-সঞ্চয়ন—৪৲**
৩। ঝলমল ৩৲ ৪। আজব বই ৩৲ ৫। শিশু-গল্পিকা ৩৲ ৬। সোনার কাঠি ৩৲
৭। যাদুঘর ৩৲ ৮। **চিত্রদীপ ৪৲** ৯। মায়ামুকুর ৩৲ ১০। সোনালী ফসল ৩৲
১১। মধুমেলা—৪৲ ১২। রূপরেখা—৩৲ ১৩। বর্ষ-মঙ্গল—৩৲
১৪। আলপনা—৪৲ ১৫। রাঙ্গারাখী—৩৲ ১৬। নবারুণ—৪৲
১৭। অঞ্জলি—৩৲ ১৮। আবাহন—৩৲ ১৯। উদয়ন ৩৲
২০। **অভিষেক—৪৲** ২১। **পরশমণি—৪৲** ২২। **বসুধারা—৪৲**
২৩। **ইন্দ্রধনু—৪৲** ২৪। **দেবালয়—৪৲** ২৫। **জয়যাত্রা—৪৲**
শোনো শোনো গল্প শোনো—২৲

বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ

সুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত

১। জ্ঞানবিজ্ঞানের নানাকথা ১||০
২। বিজ্ঞানের স্বপ্নপুরী ১৲
৩। বিজ্ঞানের মায়াজাল ১৲

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত

৪। বিশ্বের বিস্ময় ১৲

চন্দ্রকান্ত দত্ত-সরস্বতী প্রণীত

৫। দুনিয়ার আজব ১৲

প্রভাতকুমার গোস্বামী প্রণীত

৬। বিজ্ঞানের যুগান্তর ১৲
৭। বিজ্ঞান-জগৎ ১৲

খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

৮। অতীতের পৃথিবী ১||০

অরুণচন্দ্র দেব প্রণীত

৯। জ্ঞানের আলো ১৲

সুষমা সেন প্রণীত

১০। জ্ঞানের সন্ধানে ১|০

=বিশ্বপ্রতিভা সিরিজ=

চন্দ্রকান্ত দত্ত-সরস্বতী প্রণীত

১। ঋষি অরবিন্দ ১৲

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

২। রাষ্ট্রনেতা জওহরলাল ১৲
৩। যাদুকর মার্কণী ১৲
৪। সমুদ্রজয়ী কলম্বাস্ ১৲
৫। এব্রাহাম লিন্‌কলন্ ১৲

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

৬। সত্যাশ্রয়ী বাপুজী ২৲
৭। বলদর্পী হিট্‌লার ১৲
৮। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ১||০
৯। মহাপুরুষ আশুতোষ ১৲
১০। মহামনীষী জর্জ্জ বার্ণাড্ শ ১৲

মহম্মদ ওয়াজেদ আলি প্রণীত

১১। ছোটদের হজরত ১৲
১২। কায়েদে আজম জিন্নাহ ১||০

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

১৩। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১||০

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

১৪। দানবীর কার্ণেগী ১৲
১৫। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন ১৲

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

১৬। ভগবানের চাবুক ১৲
১৭। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ১৲

সরলা ও প্রফুল্ল নন্দী প্রণীত

১৮। প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট ১৲

দীনেশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১৯। বিপ্লবী স্টালিন ১৲

শ্রীশান্তি দেবী প্রণীত

২০। বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ১৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

২১। জনসেবক লেনিন ১||০

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

২২। লৌহমানব প্যাটেল ১||০

মধুসূদন মজুমদার প্রণীত

২৩। জনসেবক বিধানচন্দ্র ১||০

বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ-সিরিজ

[প্রত্যেকখানির মূল্য ১।৹ টাকা]

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত

অলিভার টুইষ্ট

এক হতভাগ্য অনাথ বালক ক্ষুধা ও চোখের জল সম্বল করে নির্ম্মম অত্যাচারের মধ্যেও বড় হয়ে ওঠে।

দীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

ডাঃ জেকিল এণ্ড মিষ্টার হাইড্

মানুষেরি মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেরি মাঝে সুরাসুর, এই সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য রবার্ট লুই স্টিভেনসনের রোমাঞ্চকর কাহিনী।

সুধীন্দ্রনাথ রাহা অনূদিত

এ টেল অব্ টু সিটিজ্

ফরাসী-বিপ্লবের বীভৎস নৃশংসতার নির্ম্মম অভিযানের মধ্যেও কত চোখের জল ও কত গোপন আত্মদান!

খগেন্দ্রনাথ মিত্র অনূদিত

ব্ল্যাক অ্যারো

প্রতিহিংসার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে "ব্ল্যাক্ অ্যারো" বা "কালো তীর" তার নির্দ্দিষ্ট শিকারকে লক্ষ্য করে মৃত্যু বিলিয়ে চলে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত

ক্যুয়ো ভাদিস্

নিরো! যার নামে শয়তান পর্য্যন্ত ভয়ে কেঁপে ওঠে···সেই নিরোর পৈশাচিক অত্যাচারের নির্ম্মম কাহিনী।

হেমেন্দ্রকুমার রায় অনূদিত

কাউণ্ট অব্ মণ্টি-ক্রিষ্টো

বিশ্বাসঘাতক বন্ধু ও শত্রুর চক্রান্তে অন্ধকূপে বন্দী হলেও ভাগ্য ছিল যার সুপ্রসন্ন, উন্মুক্ত জগতের বুকে সে একদিন অভিনব কাউণ্ট হয়ে ফিরে এলো!

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনূদিত

ট্রেজার আইল্যাণ্ড

গোপন রত্ন-ভাণ্ডারের সন্ধানে দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে, পদে পদে কত বাধা ও বিপদের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম!

বিশু মুখোপাধ্যায় অনূদিত

অ্যাড্ভেঞ্চার অব্ মার্কোপোলো

দেশ-ভ্রমণের উন্মাদ নেশায় কিশোর বালক মার্কোপোলো শত বাধা-বিঘ্ন ও কারাবাসের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন,—তাঁরই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

—এ ছাড়া—

সামসান ও ডালিলা
থ্রী মাস্কেটিয়ার্স
কিং সলোমনস্ মাইনস্
লাষ্ট ডেজ্ অফ্ পম্পাই
দি লাইট্ হাউস্
আঙ্কল টমস্ কেবিন
লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্স
ফ্রাঙ্কেনষ্টিন
বেন্ হুর
ক্রাইম এণ্ড পানিশ্মেণ্ট
টয়লার্স অব দি সী

তখন অন্ধ, বধির শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল যে, কে তাঁহাকে কোলে করিয়া বসাইল—তাঁহার অঙ্গের সৌরভে দিক্ পূরিল। সহসা শৈবলিনীর বধিরতা ঘুচিল—চক্ষু আবার দর্শনক্ষম হইল—সহসা শৈবলিনীর বোধ হইল—এ স্বপ্ন নহে, প্রকৃত। শৈবলিনী চেতনা-প্রাপ্ত হইলেন।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, গুহামধ্যে অল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে ; বাহিরে পক্ষীর প্রভাত-কূজন শুনা যাইতেছে। কিন্তু এ কি এ ? কাহার অঙ্কে তাঁহার মাথা রহিয়াছে—কাহার মুখমণ্ডল তাঁহার মস্তকোপরি, গগনোদিত পূর্ণচন্দ্রবৎ এ প্রভাতান্ধকারে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে ? শৈবলিনী চিনিলেন,—চন্দ্রশেখর—ব্রহ্মচারিবেশে চন্দ্রশেখর ।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নৌকা ডুবিল

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "শৈবলিনী !"

শৈবলিনী উঠিয়া বসিলেন, চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিলেন, মাথা ঘুরিল, শৈবলিনী পড়িয়া গেলেন; মুখ চন্দ্রশেখরের চরণে ঘর্ষিত হইল। চন্দ্রশেখর তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। তুলিয়া আপন শরীরের উপর ভর করিয়া শৈবলিনীকে বসাইলেন।

শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিলেন, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে-কাঁদিতে চন্দ্রশেখরের চরণে পুনঃপতিত হইয়া বলিলেন, "এখন আমার দশা কি হইবে ?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলে কেন ?"

শৈবলিনী চক্ষু মুছিলেন, রোদন সম্বরণ করিলেন—স্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন, "বোধ হয় আমি আর অতি অল্পদিন বাঁচিব।" শৈবলিনী শিহরিলেন, স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার মনে পড়িল—ক্ষণেক কপালে হাত দিয়া নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—"অল্পদিন বাঁচিব, মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল। এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে ?"

চন্দ্র। তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই—আমি জানি, তোমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছিল।

শৈব। সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ডাকাইতির পূর্ব্বে ফষ্টর আমার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইলেন। ধীরে-ধীরে শৈবলিনীকে পুনরপি শুয়াইলেন; ধীরে-ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, গমনোন্মুখ হইয়া মৃদু-মধুরস্বরে বলিলেন,—"শৈবলিনি! দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্ত কর। উভয়ে বাঁচিয়া থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত।"

শৈবলিনী হাত যোড় করিলেন,—বলিলেন, "আর একবার বসো। বোধ হয় প্রায়শ্চিত্ত আমার অদৃষ্টে নাই।" আবার সেই স্বপ্ন মনে পড়িল—"বসো—তোমায় ক্ষণেক দেখি।"

চন্দ্রশেখর বসিলেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আত্মহত্যায় পাপ আছে কি ?" শৈবলিনী স্থির দৃষ্টিতে চন্দ্রশেখরের প্রতি চাহিয়াছিলেন, তাঁহার প্রফুল্ল নয়নপদ্ম জলে ভাসিতেছিল।

চন্দ্র। আছে। কেন মরিতে চাও ?

শৈবলিনী শিহরিলেন। বলিলেন, "মরিতে পারিব না, সেই নরকে পড়িব।"

চন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই নরক হইতে উদ্ধার হইবে।

শৈব। এ মনোনরক হইতে উদ্ধারের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

চন্দ্র। সে কি ?

শৈব। এ পর্ব্বতে দেবতারা আসিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাকে কি করিয়াছেন, বলিতে পারি না, আমি রাত্রি-দিন নরক স্বপ্ন দেখি।

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনীর দৃষ্টি গুহাপ্রান্তে স্থাপিত হইয়াছে —যেন দূরে কিছু দেখিতেছে। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিতেছ ?"

শৈবলিনী কথা কহিলেন না, পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন ভয় পাইতেছ ?"

শৈবলিনী প্রস্তরবৎ! চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—অনেকক্ষণ নীরব হইয়া শৈবলিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ শৈবলিনী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন— "প্রভু, রক্ষা কর! রক্ষা কর! তুমি আমার স্বামী। তুমি না রাখিলে কে রাখে ?"

শৈবলিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

চন্দ্রশেখর নিকটস্থ নির্ঝর হইতে জল আনিয়া শৈবলিনীর মুখে সিঞ্চন করিলেন, উত্তরীয়ের দ্বারা ব্যজন করিলেন। কিছুকাল পরে শৈবলিনী চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। শৈবলিনী উঠিয়া বসিলেন। নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলে কেন ?"

শৈবলিনী চক্ষু মুছিলেন, রোদন সম্বরণ করিলেন—স্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন, "বোধ হয় আমি আর অতি অল্পদিন বাঁচিব।" শৈবলিনী শিহরিলেন, স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার মনে পড়িল—ক্ষণেক কপালে হাত দিয়া নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—"অল্পদিন বাঁচিব, মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল। এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে ?"

চন্দ্র। তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই—আমি জানি, তোমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছিল।

শৈব। সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ডাকাইতির পূর্ব্বে ফষ্টর আমার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইলেন। ধীরে-ধীরে শৈবলিনীকে পুনরপি শুয়াইলেন ; ধীরে-ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, গমনোন্মুখ হইয়া মৃদু-মধুরস্বরে বলিলেন,—"শৈবলিনি ! দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্ত কর। উভয়ে বাঁচিয়া থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত।"

শৈবলিনী হাত যোড় করিলেন,—বলিলেন, "আর একবার বসো। বোধ হয় প্রায়শ্চিত্ত আমার অদৃষ্টে নাই।" আবার সেই স্বপ্ন মনে পড়িল—"বসো—তোমায় ক্ষণেক দেখি।"

চন্দ্রশেখর বসিলেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আত্মহত্যায় পাপ আছে কি ?" শৈবলিনী স্থির দৃষ্টিতে চন্দ্রশেখরের প্রতি চাহিয়াছিলেন, তাঁহার প্রফুল্ল নয়নপদ্ম জলে ভাসিতেছিল।

চন্দ্র। আছে। কেন মরিতে চাও ?

শৈবলিনী শিহরিলেন। বলিলেন, "মরিতে পারিব না, সেই নরকে পড়িব।"

চন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই নরক হইতে উদ্ধার হইবে।

শৈব। এ মনোনরক হইতে উদ্ধারের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

চন্দ্র। সে কি ?

শৈব। এ পর্ব্বতে দেবতারা আসিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাকে কি করিয়াছেন, বলিতে পারি না, আমি রাত্রি-দিন নরক স্বপ্ন দেখি।

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনীর দৃষ্টি গুহাপ্রান্তে স্থাপিত হইয়াছে —যেন দূরে কিছু দেখিতেছে। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিতেছ ?"

শৈবলিনী কথা কহিলেন না, পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন ভয় পাইতেছ ?"

শৈবলিনী প্রস্তরবৎ! চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—অনেকক্ষণ নীরব হইয়া শৈবলিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ শৈবলিনী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন— "প্রভু, রক্ষা কর! রক্ষা কর! তুমি আমার স্বামী! তুমি না রাখিলে কে রাখে ?"

শৈবলিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

চন্দ্রশেখর নিকটস্থ নির্ঝর হইতে জল আনিয়া শৈবলিনীর মুখে সিঞ্চন করিলেন, উত্তরীয়ের দ্বারা ব্যজন করিলেন। কিছুকাল পরে শৈবলিনী চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। শৈবলিনী উঠিয়া বসিলেন। নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “কি দেখিতেছিলে ?”

শৈব। সেইরকম।

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরম্ভ হইয়াছে। শৈবলিনী ক্ষণপরে বলিলেন, “আমি মরিতে পারিব না—আমার ঘোরতর নরকের ভয় হইয়াছে, মরিলেই নরকে যাইব, আমাকে বাঁচিতেই হইবে। কিন্তু আমি একাকিনী, আমি দ্বাদশ-বৎসর কি বাঁচিব ? আমি চেতনে—অচেতনে কেবল নরক দেখিতেছি !”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “চিন্তা নাই—উপবাসে এবং মানসিক ক্লেশে এ-সকল উপস্থিত হইয়াছে। বৈদ্যেরা ইহাকে বায়ুরোগ বলেন। তুমি বেদগ্রামে গিয়া গ্রামপ্রান্তে কুটীর নির্ম্মাণ কর। সেখানে সুন্দরী আসিয়া তোমার তত্ত্বাবধান করিবেন—চিকিৎসা করিতে পারিবেন।”

সহসা শৈবলিনী চক্ষু মুদিলেন,—চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনী আবার মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন।

তখন চন্দ্রশেখর তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া, গুহা হইতে বাহির হইয়া, যথায় পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অতি ক্ষীণা নির্ঝরিণী নিঃশব্দে জলোদ্‌গার করিতেছিল—তথায় আনিলেন। মুখে জলসেচন করাতে এবং অনাবৃত স্থানের অনবরুদ্ধ বায়ুস্পর্শে শৈবলিনী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু চাহিলেন—বলিলেন, “আমি কোথায় আসিয়াছি ?”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “আমি তোমাকে বাহিরে আনিয়াছি।”

শৈবলিনী শিহরিলেন—আবার ভীতা হইলেন। বলিলেন, “তুমি কে ?” চন্দ্রশেখরও ভীত হইলেন। বলিলেন, “কেন এরূপ করিতেছ ? আমি যে তোমার স্বামী—চিনিতে পারিতেছ না কেন ?”

শৈবলিনী হা-হা করিয়া হাসিলেন, বলিলেন—

"তুমি—লরেন্স ফষ্টর ?"

চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে, যে-দেবীর প্রভাবে এই মনুষ্যদেহ সুন্দর, তিনি শৈবলিনীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—বিকট উন্মাদ আসিয়া তাঁহার সুবর্ণমন্দির অধিকার করিতেছে। চন্দ্রশেখর রোদন করিলেন। অতি মৃদুস্বরে, কত আদরে আবার ডাকিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী আবার হাসিলেন, বলিলেন, "শৈবলিনী কে ? রসো, রসো। একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। একদিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল—মেয়েটি ব্যাঙ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙটিকে গিলে ফেললে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। হ্যাঁ গা সাহেব! তুমি কি লরেন্স ফষ্টর ?"

চন্দ্রশেখর গদ্‌গদকণ্ঠে সকাতরে ডাকিলেন,—"গুরুদেব, এ কি করিলে ?"

সহসা শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইলেন—কোন কথা না বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—কত কাঁদিলেন—তাঁহার অশ্রুজলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত হইল। চন্দ্রশেখরও কাঁদিলেন। শৈবলিনী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চল।"

শৈবলিনী বলিলেন, "আমাকে মারিবে না।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর গাত্রোত্থান করিলেন।

শৈবলিনীও উঠিলেন। চন্দ্রশেখর বিষণ্ণবদনে চলিলেন—উন্মাদিনী পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিলেন—কখনও হাসিতে লাগিলেন—কখনও কাঁদিতে লাগিলেন—কখনও গাহিতে লাগিলেন।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রচ্ছাদন—আমিয়টের পরিণাম

মুরশিদাবাদে আসিয়া ইংরেজের নৌকাসকল পৌঁছিল। মীর কাসেমের নায়েব মহম্মদ তকি খাঁর নিকট সংবাদ আসিল যে, আমিয়ট পৌঁছিয়াছে।

মহাসমারোহের সহিত আসিয়া মহম্মদ তকি আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আমিয়ট আপ্যায়িত হইলেন। মহম্মদ তকি খাঁ পরিশেষে আমিয়টকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। আমিয়ট অগত্যা স্বীকার করিলেন; কিন্তু প্রফুল্লমনে নহে। এদিকে মহম্মদ তকি দূরে অলক্ষিতরূপে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন—ইংরেজের নৌকা খুলিয়া না যায়।

মহম্মদ তকি চলিয়া গেলে, ইংরেজেরা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, নিমন্ত্রণে যাওয়া কর্ত্তব্য কি না? গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ এই মত ব্যক্ত করিলেন যে, ভয় কাহাকে বলে, তাহা ইংরেজ জানে না, জানাও কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে। আমিয়ট বলিলেন,

"যখন ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি এবং অসদ্ভাব যত দূর হইতে হয় হইয়াছে, তখন আবার ইহাদিগের সঙ্গে আহার-ব্যবহার কি ?" আমিয়ট স্থির করিলেন, নিমন্ত্রণে যাইবেন না।

এদিকে যে-নৌকায় দলনী ও কুল্‌সম্‌ বন্দি-স্বরূপে সংরক্ষিত ছিলেন, সে-নৌকাতেও নিমন্ত্রণ-সংবাদ পৌঁছিল। দলনী ও কুল্‌সম্‌ কানে-কানে কথা কহিতে লাগিলেন। দলনী বলিলেন, "কুল্‌সম্‌, শুনিতেছ ? বুঝি মুক্তি নিকট।"

কু। কেন ?

দ। তুই যেন কিছুই বুঝিস্‌ না; যাহারা নবাবের বেগমকে কয়েদ করিয়া আনিয়াছে—তাহাদের যে, নবাবের পক্ষ হইতে সাদর নিমন্ত্রণ হইয়াছে, ইহার ভিতর কিছু গূঢ় অর্থ আছে। বুঝি আজ ইংরেজ মরিবে।

কু। তাতে কি তোমার আহ্লাদ হইয়াছে ?

দ। নহে কেন ? একটা রক্তারক্তি না হইলেই ভালো হয়। কিন্তু যাহারা আমাকে অনর্থক কয়েদ করিয়া আনিয়াছে, তাহারা মরিলে যদি আমরা মুক্তি পাই, তাহাতে আমার আহ্লাদ বৈ কি ?

কু। কিন্তু, মুক্তির জন্য এত ব্যস্ত কেন ? আমরা স্ত্রীজাতি, যেখানে যাইব, সেইখানেই আটক।

দলনী বড় রাগ করিলেন। বলিলেন, "আপন ঘরে থাকিলেও আমি দলনী বেগম, ইংরেজের নৌকায় আমি বাঁদী। তোর সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের কেন আটক করিয়া রাখিয়াছে বলিতে পারিস ?"

কু। তা ত' বলিয়াই রাখিয়াছি। মুঙ্গেরে যেমন হে-সাহেব

ইংরেজের জামিন হইয়া আটক আছে, আমরাও তেমনই নবাবের জামিন হইয়া ইংরেজের কাছে আটক আছি। হে-সাহেবকে ছাড়িয়া দিলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। হে-সাহেবের অনিষ্ট ঘটিলেই আমাদেরও অনিষ্ট ঘটিবে ; নহিলে ভয় কি ?

দলনী আরও রাগিলেন, বলিলেন, "আমি তোর হে-সাহেবকে চিনি না, তোর ইংরেজের গোঁড়ামি শুনিতে চাহি না, ছাড়িয়া দিলেও তুই বুঝি যাইবি না ?"

কুল্‌সম্ রাগ না করিয়া হাসিয়া বলিল, "যদি আমি না যাই, তবে তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া যাও ?"

দলনী রাগ ত্যাগ করিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "আমি অনন্যগতি। মরিতে হয়, তাঁহারই চরণে পতিত হইয়া মরিব।"

এদিকে আমিয়ট আপনার আজ্ঞাধীন সিপাহীগণকে সজ্জিত হইতে বলিলেন। জন্‌সন্ বলিলেন—"এখানে আমরা তত বলবান্ নহি—রেসিডেন্সির নিকট নৌকা লইয়া গেলে হয় না ?"

আমিয়ট বলিলেন, "যেদিন একজন ইংরেজ, দেশীলোকের ভয়ে পলাইবে, সেইদিন ভারতবর্ষে ইংরেজ-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইবে। এখান হইতে নৌকা খুলিলেই মুসলমান বুঝিবে যে, আমরা ভয়ে পলাইলাম। দাঁড়াইয়া মরিব, সেও ভালো, তথাপি ভয় পাইয়া পলাইব না। কিন্তু ফষ্টর পীড়িত। শস্ত্রহস্তে মরিতে অক্ষম—অতএব তাহাকে রেসিডেন্সিতে যাইতে অনুমতি কর। তাহার নৌকায় বেগম ও দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিকে উঠাইয়া দাও এবং দুইজন সিপাহী সঙ্গে দাও, বিবাদের স্থানে উহাদের থাকা অনাবশ্যক।"

আমিয়টের আজ্ঞানুসারে দলনী ও কুল্‌সম্‌ ফষ্টরের নৌকায় উঠিলেন। দুইজন সিপাহী সঙ্গে ফষ্টরের নৌকা খুলিয়া গেল। দেখিয়া মহম্মদ তকির প্রহরীরা তাঁহাকে সংবাদ দিতে গেল।

এ-সংবাদ শুনিয়া এবং ইংরেজদিগের আসিবার সময় অতীত হইল দেখিয়া, মহম্মদ তকি ইংরেজদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। আমিয়ট উত্তর করিলেন যে, কারণ বশতঃ তাঁহারা নৌকা হইতে উঠিতে অনিচ্ছুক।

দূত নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কিছুদূরে আসিয়া একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। সেই শব্দের সঙ্গে তীর হইতে বন্দুকের দশ-বারোটা শব্দ হইল। আমিয়ট দেখিলেন, নৌকার উপর গুলী বর্ষণ হইতেছে এবং স্থানে-স্থানে নৌকার ভিতরে গুলী প্রবেশ করিতেছে।

তখন ইংরেজ-সিপাহীরাও উত্তর দিল। উভয়পক্ষে উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়াতে, শব্দে হুলস্থূল পড়িল।

তখন মুসলমানেরা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তরবারি ও বর্শা হস্তে চীৎকার করিয়া আমিয়টের নৌকাভিমুখে ধাবিত হইল।

মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমিয়ট, গল্‌ষ্টন্‌ ও জন্‌সন্‌ স্বহস্তে বন্দুক লইয়া অব্যর্থ সন্ধানে প্রতিবারে এক-এক জনে এক-এক জনকে বালুকাশায়ী করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁহারা যুঝিতে পারিলেন না।

মুসলমানেরা আমিয়টের নৌকায় উঠিল। তিনজন ইংরেজ এক হইয়া এককালীন আওয়াজ করিলেন।

আরও মুসলমান নৌকার উপর উঠিল। আরও কতকগুলা মুসলমান মুদ্গরাদি লইয়া নৌকার তলে আঘাত করিতে লাগিল।

নৌকার তলদেশ ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় কল-কল শব্দে তরণী জলপূর্ণ হইতে লাগিল।

আমিয়ট সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "গোমেষাদির ন্যায় জলে ডুবিয়া মরিব? বাহিরে আইস; বীরের ন্যায় অস্ত্রহস্তে মরি।"

তখন তরবারিহস্তে তিনজন ইংরেজ অকুতোভয়ে সেই অগণিত শত্রুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন পাঠান, আমিয়টকে সেলাম করিয়া বলিল, "কেন মরিবেন? আমাদিগের সঙ্গে আসুন।"

আমিয়ট বলিলেন, "মরিব। আমরা আজি এখানে মরিলে ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইবে। আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে, তৃতীয় জর্জ্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।"

"তবে মর।" এই বলিয়া পাঠান, তরবারির আঘাতে আমিয়টের মুণ্ড চিরিয়া ফেলিল; দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে গল্‌ষ্টন্‌ সেই পাঠানের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিলেন।

তখন দশ-বারোজন পাঠানে গল্‌ষ্টন্‌কে ঘিরিয়া প্রহার করিতে লাগিল এবং অচিরাৎ বহু লোকের প্রহারে আহত হইয়া গল্‌ষ্টন্‌ ও জন্‌সন্‌ উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া নৌকার উপরে শুইলেন।

তৎপূর্ব্বেই ফষ্টর নৌকা খুলিয়া দিয়াছিল।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবার সেই

ফষ্টর দ্রুত নৌকা চালাইতেছিল—তথাপি ভয়, পাছে মুসলমান পশ্চাদ্ধাবিত হয়। ফষ্টর যথার্থ অনুমান করিয়াছিল। মুসলমানেরা অচিরাৎ কাশিমবাজারে গিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়া তাহা লুঠ করিল।

ফষ্টর দ্রুতবেগে কাশিমবাজার, ফরাসডাঙ্গা, সেদাবাদ, রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়া গেল। তথাপি ভয় যায় না। যে-কোন নৌকা পশ্চাতে আইসে, মনে করে, শত্রুর নৌকা আসিতেছে। দেখিল, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা কোনমতেই সঙ্গ ছাড়িল না।

ফষ্টর তখন রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাহার এক কুবুদ্ধি উপস্থিত হইল। এই স্ত্রীলোকদিগের জন্য যবনেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। দলনী যে নবাবের বেগম, তাহা সে শুনিয়াছিল—মনে ভাবিল, বেগমের জন্যই মুসলমানেরা ইংরেজের নৌকা আক্রমণ করিয়াছে। অতএব বেগমকে ছাড়িয়া দিলে আর কোন গোল থাকিবে না।

তাই দলনীকে বলিল, "ঐ একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আমাদের পাছু-পাছু আসিতেছে দেখিতেছ?"

দলনী বলিলেন, "দেখিতেছি।"

ফ। উহা তোমাদের লোকের নৌকা—তোমাকে কাড়িয়া লইবার জন্য আসিতেছে।

এরূপ মনে করিবার কোন কারণ ছিল? কিছুই না, কেবল ফষ্টরের বিকৃত বুদ্ধিই ইহার কারণ—সে রজ্জুতে সর্প দেখিল।

দলনী আশায় মুগ্ধ হইয়া সে-কথা বিশ্বাস করিলেন—বলিলেন, "তবে কেন এই নৌকায় আমাদের উঠাইয়া দাও না?"

ফ। আমি তাহা পারিব না। উহারা আমার নৌকা ধরিতে পারিলে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

তখন দলনী বলিলেন, "তবে আমাদের তীরে নামাইয়া দিয়া তুমি চলিয়া যাও।"

ফষ্টর সানন্দে সম্মত হইল। নৌকা তীরে লাগাইতে হুকুম দিল।

কুল্‌সম্ বলিল, "আমি নামিব না। আমি নবাবের হাতে পড়িলে আমার কপালে কি আছে, বলিতে পারি না। আমি সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায় যাইব—সেখানে আমার জানা-শুনা লোক আছে।"

দলনী বলিলেন, "তোর কোন চিন্তা নাই। যদি আমি বাঁচি, তবে তোকেও বাঁচাইব।"

কুল্‌সম্। তুমি বাঁচিলে ত'?

কুল্‌সম্ কিছুতেই নামিতে রাজি হইল না। দলনী তাহাকে অনেক বিনয় করিলেন—সে কিছুতেই শুনিল না।

ফষ্টর কুল্‌সম্‌কে বলিল, "কি জানি, যদি তোমার জন্য নৌকা পিছু-পিছু আইসে। তুমিও নামো।"

কুল্‌সম্ বলিল, "যদি আমাকে ছাড়ো, তবে আমি ঐ নৌকায় উঠিয়া যাহাতে নৌকাওয়ালারা তোমার সঙ্গ না ছাড়ে, তাহাই করিব।"

ফষ্টর ভয় পাইয়া আর কিছু বলিল না—দলনী কুল্‌সমের জন্য চক্ষের জল ফেলিয়া নৌকা হইতে উঠিলেন। ফষ্টর নৌকা খুলিয়া চলিয়া গেল। তখন সূর্য্যাস্তের অল্পমাত্র বিলম্ব আছে।

ফষ্টরের নৌকা ক্রমে দৃষ্টির বাহির হইল, যে ক্ষুদ্র তরণীকে নিজামতের নৌকা ভাবিয়া ফষ্টর দলনীকে নামাইয়া দিয়াছিল, সে নৌকাও নিকটে আসিল। প্রতিক্ষণে দলনী মনে করিতে লাগিলেন যে, নৌকা কূলে ভিড়িবে, কিন্তু নৌকা ভিড়িল না। তখন তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে কি না, সেই সন্দেহে দলনী অঞ্চল উর্দ্ধোত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। তথাপি নৌকা ফিরিল না, বাহিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় দলনীর চমক হইল—এ-নৌকা নিজামতের কিসে সিদ্ধান্ত করিলাম? অপরের নৌকা হইতেও পারে! দলনী তখন ক্ষিপ্তার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে সেই নৌকার নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। "এ নৌকায় হইবে না" বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

দলনীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। ফষ্টরের নৌকা তখন দৃষ্টির অতীত হইয়াছিল—তথাপি তিনি কূলে-কূলে দৌড়াইলেন, তাহা ধরিতে পারিবেন বলিয়া দলনী কূলে-কূলে দৌড়াইলেন। কিন্তু বহুদূরে দৌড়াইয়াও নৌকা ধরিতে পারিলেন না। পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইয়াছিল—এক্ষণে অন্ধকার হইল। গঙ্গার উপরে আর কিছু দেখা যায় না।

ক্ষণকাল পরে দলনী আর গঙ্গাগর্ভ মধ্যে বসিয়া কোন ফল নাই বিবেচনা করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে-ধীরে উপরে উঠিলেন। অন্ধকারে উঠিবার পথ দেখা যায় না। দুই-একবার পড়িয়া উঠিলেন। উঠিয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, কোনদিকে কোন গ্রামের কোন চিহ্ন নাই—কেবল অন্তর প্রান্তর, আর সেই কলনাদিনী নদী; মনুষ্যের ত' কথাই নাই—কোনদিকে আলো দেখা যায় না—গ্রাম দেখা যায় না—বৃক্ষ দেখা যায় না—পথ

দেখা যায় না—শৃগাল-কুক্কুর ভিন্ন কোন জন্তু দেখা যায় না—কলনাদিনী নদীপ্রবাহে নক্ষত্র নাচিতেছে দেখা যায়। দলনী মৃত্যু নিশ্চয় করিলেন।

সেইখানে প্রান্তরমধ্যে নদীর অনতিদূরে দলনী বসিলেন। নিকটে ঝিল্লী রব করিতে লাগিল—নিকটেই শৃগাল ডাকিতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে গভীরা হইল—অন্ধকার ক্রমে ভীমতর হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে দলনী মহাভয় পাইয়া দেখিলেন, সেই প্রান্তরমধ্যে এক দীর্ঘাকার পুরুষ একা বিচরণ করিতেছেন। দীর্ঘাকৃতি পুরুষ বিনা বাক্যে দলনীর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

আবার সেই! এই দীর্ঘাকৃতি পুরুষই শৈবলিনীকে তুলিয়া লইয়া ধীরে-ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নৃত্য-গীত

মুঙ্গেরে প্রশস্ত অট্টালিকামধ্যে স্বরূপচন্দ্ জগৎশেঠ এবং মহাতাব্‌চন্দ্ জগৎশেঠ দুই ভাই বাস করিতেছিলেন। তথায় নিশীথে সহস্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। দীপরশ্মি উজ্জ্বল প্রস্তরস্তম্ভে, নর্ত্তকীর কণ্ঠ, কেশ ও কর্ণের আভরণে জ্বলিতেছিল!

বাঙলা রাজ্যে সমরাগ্নি এক্ষণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অনুমতি পাইবার পূর্ব্বেই পাটনার এলিস্ সাহেব পাটনার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি দুর্গ অধিকার করেন; কিন্তু মুঙ্গের হইতে মুসলমান-সৈন্য প্রেরিত হইয়া পাটনাস্থিত মুসলমান-সৈন্যের

সহিত একত্র হইয়া, পাটনা পুনর্ব্বার মীর কাসেমের অধিকারে লইয়া আইসে। এলিস্ প্রভৃতি পাটনাস্থিত ইংরেজরা মুসলমানদিগের হাতে পতিত হইয়া, মুঙ্গেরে বন্দিভাবে আনীত হয়েন। এক্ষণে উভয়পক্ষে প্রকৃতভাবে রণসজ্জা করিতেছিলেন। শেঠদিগের সহিত গুর্‌গন্ খাঁ সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। নৃত্য-গীত উপলক্ষমাত্র। জগৎশেঠেরা বা গুর্‌গন্ খাঁ কেহই তাহা শুনিতেছিলেন না।

গুর্‌গন্ খাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল—তিনি মনে করিলেন যে, উভয়পক্ষে বিবাদ করিয়া ক্ষীণবল হইলে তিনি উভয়পক্ষকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং বাঙলার অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু সে অভিলাষ-সিদ্ধির পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে, সেনাগণ তাঁহারই বাধ্য থাকে। সেনাগণ অর্থ ভিন্ন বশীভূত হইবে না—শেঠকুবেরগণ সহায় না হইলে অর্থ সংগ্রহ হয় না। অতএব গুর্‌গন্ খাঁর পক্ষে শেঠদিগের সঙ্গে পরামর্শ নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এদিকে কাসেম আলি খাঁও বিলক্ষণ জানিতেন যে, যে-পক্ষকে এই কুবেরযুগল অনুগ্রহ করিবেন, সেইপক্ষ জয়ী হইবে। জগৎশেঠেরা যে মনে-মনে তাঁহার অহিতাকাঙ্ক্ষী, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। কেন না, তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নাই। সন্দেহবশত তাঁহাদিগকে মুঙ্গেরে বন্দিস্বরূপ রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা সুযোগ পাইলেই তাঁহার বিপক্ষের সঙ্গে মিলিত হইবেন—ইহা স্থির করিয়া তিনি শেঠদিগকে দুর্গমধ্যে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শেঠেরা তাহা জানিতে পারিয়াছিল। এ-পর্য্যন্ত তাহারা ভয়প্রযুক্ত মীর কাসেমের প্রতিকূলে কোন আচরণ করে নাই; এক্ষণে অন্যথা রক্ষার উপায় নাই দেখিয়া, গুর্‌গন্ খাঁর সঙ্গে মিলিল। মীর কাসেমের

নিপাত উভয়ের উদ্দেশ্য। গুরগন্ খাঁ বলিতেছেন,—"আপনাদের সঙ্গে আমি একটি কুঠী খুলিব, আপনারা বখরাদার হইতে স্বীকার আছেন ?"

মহাতাব্‌চন্দ্। কি মতলব ?

গুর্। মুঙ্গেরের বড় কুঠী বন্ধ করিবার জন্য।

মহা। স্বীকৃত আছি—এরূপ একটা নূতন কারবার না আরম্ভ করিলে আমাদের আর কোন উপায় দেখি না।

কথাবার্ত্তা স্থির হইলে গুর্‌গন্ বলিতে লাগিলেন, "একজন নূতন বণিক্ কুঠী খুলিতেছে, কিছু শুনিয়াছেন ?"

মহা। না—দেশী না বিলাতী ?

গুর্। দেশী।

মহা। কোথায় ?

গুর্। মুঙ্গের হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত সকল স্থানে। যেখানে পাহাড়, যেখানে জঙ্গল, যেখানে মাঠ, সেইখানে তাহার কুঠী বসিতেছে।

মহা। হিন্দু না মুসলমান ?

গুর্। হিন্দু।

মহা। নাম কি ?

গুর্। প্রতাপ রায়।

মহা। বাড়ী কোথায় ?

গুর্। মুরশিদাবাদের নিকট।

মহা। নাম শুনিয়াছি—সে সামান্য লোক।

গুর্। অতি ভয়ানক লোক।

মহা। কেন সে হঠাৎ এ-প্রকার করিতেছে?

গুর্। কলিকাতার বড় কুঠীর উপর রাগ।

মহা। তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে।

জমি-জমা তালুক-মুলুক দিয়াও প্রতাপকে বশ করিতে হইবে, এই তাঁহারা স্থির করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দলনী কি করিলেন

মহাকায় পুরুষ নিঃশব্দে দলনীর পাশে আসিয়া বসিলেন। দলনী কাঁদিতেছিলেন, ভয় পাইয়া রোদন সংবরণ করিলেন, নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। আগন্তুক নিঃশব্দে রহিলেন।

যতক্ষণ এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, ততক্ষণ অন্যত্র দলনীর আর-এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছিল।

মহম্মদ তকির প্রতি গুপ্ত আদেশ ছিল যে, ইংরেজদিগের নৌকা হইতে দলনী বেগমকে হস্তগত করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবে। মহম্মদ তকি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা বন্দী, বা হত হইলে বেগম কাজে-কাজেই তাঁহার হস্তগতা হইবেন। স্থতরাং অনুচরবর্গকে বেগম সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপদেশ প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই; পরে যখন মহম্মদ তকি দেখিলেন, নিহত ইংরেজদিগের নৌকায় বেগম নাই, তখন তিনি বুঝিলেন যে, বিষম বিপদ্ উপস্থিত। তাঁহার শৈথিল্যে বা অমনোযোগে নবাব রুষ্ট হইয়া কি উৎপাত উপস্থিত করিবেন, তাহা বলা যায় না। এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া, মহম্মদ তকি

সাহসে ভর করিয়া নবাবকে বঞ্চনা করিবার কল্পনা করিলেন। লোক-পরম্পরায় তখন শুনা যাইতেছিল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই ইংরেজেরা মীরজাফরকে কারামুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার মসনদে বসাইবেন। যদি ইংরেজেরা যুদ্ধজয়ী হয়েন, তবে মীর কাসেম এ-প্রবঞ্চনা শেষে জানিতে পারিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। আপাতত বাঁচিতে পারিলেই অনেক লাভ। আর যদি মীর কাসেম জয়ী হয়েন, তবে তিনি যাহাতে প্রকৃত ঘটনা কখনও না জানিতে পারেন, এমন উপায় করা যাইতে পারে। আপাতত কোন কঠিন আজ্ঞা না আসে। এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া তকি রাত্রে নবাবের সমীপে মিথ্যাকথা-পরিপূর্ণ এক আরজি পাঠাইতেছিলেন।

মহম্মদ তকি নবাবকে লিখিলেন যে, বেগমকে আমিয়টের নৌকায় পাওয়া গিয়াছে। তকি তাঁহাকে আনিয়া যথাসম্মানপূর্বক কেল্লার মধ্যে রাখিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে হুজুরে পাঠাইতে পারিতেছেন না। ইংরেজদিগের সঙ্গী, খানসামা, নাবিক, সিপাহী প্রভৃতি যাহারা জীবিত আছে, তাহাদের সকলের প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন যে, বেগম—আমিয়টের সঙ্গে একশয্যায় শয়ন করিতেন। বেগম স্বয়ং এ-সকল কথা স্বীকার করিতেছেন। তিনি এক্ষণে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি মুঙ্গেরে যাইতে অসম্মত। বলেন, 'আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি কলিকাতায় গিয়া আমিয়ট সাহেবের সুহৃদ্গণের নিকট বাস করিব। যদি মুঙ্গেরে পাঠাও, তবে আত্মহত্যা করিব।' এমন অবস্থায় তাঁহাকে মুঙ্গেরে পাঠাইবেন, কি এখানে রাখিবেন, কি ছাড়িয়া দিবেন, তদ্বিষয়ে আজ্ঞার প্রত্যাশায় রহিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন তকি এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন।

অশ্বারোহী দূত সেই রাত্রেই এই পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল।

সেই মুহূর্ত্তে দলনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার পার্শ্বস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ প্রথম কথা কহিলেন।

পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষ বলিলেন, "তোমায় চিনি, তুমি দলনী বেগম।"

দলনী শিহরিলেন। আগন্তুক বলিলেন, "তুমি নবাবের নিকটে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর।"

দলনী উৎকণ্ঠিতা, বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "কেন ?"

"অমঙ্গল ঘটিবে।"

দলনী শিহরিলেন, "ঘটুক। সেই বৈ আর আমার স্থান নাই। অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভালো।"

"তবে উঠ। আমি তোমাকে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া আসি। মহম্মদ তকি তোমাকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমার কথা শুন। এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। নবাব স্বীয় পৌরজনকে রুহিদাসের গড়ে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তুমি সেখানে যাইও না।"

"আমার কপালে যাই থাকুক, আমি যাইব।"

"তোমার কপালে মুঙ্গের দর্শন নাই।"

"ভবিতব্য কে জানে ? চলুন, আপনার সঙ্গে মুরশিদাবাদ যাইব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, নবাবকে দেখিবার আশা ছাড়িব না।"

আগন্তুক বলিলেন, "তাহা জানি। আইস।"

দুইজনে অন্ধকার রাত্রে মুরশিদাবাদ চলিলেন।

———

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সিদ্ধি—পূর্ব্বকথা

চন্দ্রশেখরই যে পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মচারী তাহা জানা গিয়াছে। চন্দ্রশেখরের সঙ্গে রমানন্দ স্বামী যখন নবদ্বীপে অধ্যাপকদিগের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, সেইসময় নদী-পথে তাঁহারা শৈবলিনীর নৌকার সন্ধান পাইয়াছিলেন। এবং উভয়ে শৈবলিনীর গতিবিধির উপর গোপনে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। রাত্রি-প্রভাতে তাঁহারা যখন দেখিলেন, শৈবলিনী নৌকা হইতে উঠিয়া গেলেন, তখন উভয়ে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাহার পর অন্ধকার গুহামধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পাঠক জানেন।

উন্মাদগ্রস্ত শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর সেই মঠে রমানন্দ স্বামীর নিকটে লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! এ কি করিলে ?"

রমানন্দ স্বামী শৈবলিনীর অবস্থা সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভালোই হইয়াছে। ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যাও। যে-গৃহে ইনি বাস করিতেন, সেই গৃহে ইঁহাকে রাখিও।"

গুরুর আদেশমত চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গৃহে আনিলেন।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হুকুম

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীর কাসেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীর কাসেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুর্‌গন্ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, তাহা নির্ব্বাণ হইল। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সংবাদ পৌঁছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী? মীর কাসেম, মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, "দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে সেইখানে বিষ পান করাইয়া বধ করিও।"

মহম্মদ তকি স্বহস্তে বিষের পাত্র লইয়া দলনীর নিকটে গেল। মহম্মদ তকিকে তাঁহার নিকটে দেখিয়া দলনী বিস্মিতা হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ কি খাঁ সাহেব!"

মহম্মদ তকি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "কপাল! নবাব আপনার প্রতি অপ্রসন্ন।"

দলনী হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে কে বলিল?"

মহম্মদ তকি বলিল, "না বিশ্বাস করেন, পরওয়ানা দেখুন।"

দলনী পরওয়ানা পড়িয়া হাসিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "এ জাল। আমার সঙ্গে এ রহস্য কেন? তুমি জাল পরওয়ানা লইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ?"

তখন মহম্মদ তকি সত্য যাহা করিয়াছিল, তাহা বলিল। ইচ্ছা করিয়া তাহার বদনাম দিয়া নবাবকে চিঠি লিখিয়াছিল।

শুনিয়া দলনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। দলনী বলিলেন, "কেন লিখিয়াছিলে?"

মহম্মদ তকি আনুপূর্ব্বিক আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল।

তখন দলনী বলিলেন, "দেখি, পরওয়ানা আবার দেখি।"

দলনী দেখিলেন, যথার্থ বটে, জাল নহে।—"কই বিষ?"

মহম্মদ তকি বিস্মিত হইল। বলিল, "বিষ কেন?"

দ। পরওয়ানায় কি হুকুম আছে?

মহ। আপনাকে বিষপান করাইতে।

দ। তবে, কই বিষ?

মহ। আপনি বিষপান করিবেন নাকি?

দ। আমার রাজার হুকুম আমি কেন পালন করিব না?

মহম্মদ তকি মর্ম্মের ভিতর লজ্জায় মরিয়া গেল। বলিল, "যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। আপনাকে বিষপান করিতে হইবে না। আমি ইহার উপায় করিব।"

দলনীর চক্ষু হইতে ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। সেই ক্ষুদ্র দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া দলনী বলিলেন, "যে তোমার মত পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান গ্রহণ করে, সে তোমার অপেক্ষাও অধম—বিষ আন।"

তকি তখন দলনীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিল।

শুনিয়া দলনী—লিখিতে লজ্জা করে—মহম্মদ তকিকে পদাঘাত করিলেন।

তারপর মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—বাদশাহের বাদশাহ! তুমি যখন রাগ করিয়াছ—তখন আমি বিষপান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রণা!

করিমন্ নামে একজন পরিচারিকা দলনী বেগমের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। দলনী আপনার অবশিষ্ট অলঙ্কার তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "লুকাইয়া হকিমের নিকট হইতে আমাকে এমন ঔষধ আনিয়া দাও, যেন আমার নিদ্রা আসে—সে নিদ্রা আর না ভাঙে। মূল্য—এই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিও। বাকি যা থাকে, তুমি লইও।"

হকিম ঔষধ দিল। মহম্মদ তকির নিকট হরকরা আসিয়া গোপনে সংবাদ দিল, "করিমন্ বাঁদী আজ এইমাত্র হকিম মেরজা হবীবের নিকট হইতে বিষ ক্রয় করিয়া আনিয়াছে।"

মহম্মদ তকি শুনিয়া দলনীর নিকট আসিল। দেখিল, দলনী আসনে ঊর্দ্ধমুখে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে যুক্তকরে বসিয়া আছেন—সম্মুখে শূন্য পাত্র পড়িয়া আছে—দলনী বিষপান করিয়াছেন।

মহম্মদ তকি জিজ্ঞাসা করিল, "এ কিসের পাত্র ?"

দলনী বলিলেন, "ও বিষের পাত্র। আমি তোমার মত নিমক-হারাম নহি, প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি। তোমার উচিত—অবশিষ্ট পান করিয়া আমার সঙ্গে আইস।"

মহম্মদ তকি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দলনী ধীরে-ধীরে শয়ন করিলেন। চক্ষু বুজিলেন। সব অন্ধকার হইল। দলনী চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সম্রাট্ ও বাঁদী

মীর কাসেমের সেনা কাটোয়ার রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া হটিয়া আসিয়াছিল। ভাঙা কপাল গিরিয়ার ক্ষেত্রে আবার ভাঙিল—ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায়

চতুষ্পার্শ্বে খাদ প্রস্তুত করিয়া যবনেরা ইংরেজসৈন্যের গতিরোধ করিতেছিল।

মীর কাসেম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিলে, সৈয়দ আমীর হোসেন একদা জানাইলেন যে, একজন বন্দী তাঁহার দর্শনার্থ বিশেষ কাতর।

মীর কাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কে?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "একজন স্ত্রীলোক—কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব পত্র লিখিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে বাস্তবিক বন্দী নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বের পত্র বলিয়া অধীন তাহা গ্রহণ করিয়াছে।" এই বলিয়া আমীর হোসেন পত্র পড়িয়া নবাবকে শুনাইলেন।

নবাব পত্র শুনিয়া স্ত্রীলোককে সম্মুখে আসিতে অনুমতি দিলেন। সৈয়দ আমীর হোসেন বাহিরে গিয়া ঐ স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। নবাব দেখিলেন—কুল্‌সম্‌।

নবাব রুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুই কি চাহিস্‌ বাঁদী—মরিবি?"

কুল্‌সম্‌ নবাবের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া কহিল, "নবাব! তোমার বেগম কোথায়? দলনী বিবি কোথায়?"

মীর কাসেম বলিলেন, "যেখানে সেই পাপিষ্ঠা, তুইও শীঘ্রই সেইখানে যাইবি।"

কুল্‌সম্‌ বলিল, "আমিও, আপনিও। তাই আপনার কাছে আসিয়াছি। পথে শুনিলাম, লোকে রটাইতেছে, দলনী বেগম আত্মহত্যা করিয়াছে। সত্য কি?"

নবাব। আত্মহত্যা! রাজদণ্ডে সে মরিয়াছে। তুই দুষ্কর্ম্মের সহায় —তুই কুক্কুরের দ্বারা ভুক্ত হইবি।

কুল্‌সম্ আছড়াইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া, নবাবকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। শুনিয়া চারিদিক্ হইতে সৈনিক, ওমরাহ, ভৃত্য, রক্ষক প্রভৃতি আসিয়া পড়িল —তখন কুল্‌সম্ বলিতে লাগিল, "আপনারা সকলে আসিয়াছেন, ভালোই হইয়াছে। আমি এক অপূর্ব্ব কাহিনী বলিব, শুনুন। আমার এখনই বধাজ্ঞা হইবে—আমি মরিলে আর কেহ তাহা শুনিতে পাইবে না, এইসময় শুনুন।

"শুনুন, সুবে বাঙলা-বেহারের মীর কাসেম নামে এক মূর্খ নবাব আছে। দলনী নামে তাহার বেগম ছিল। সে নবাবের সেনাপতি গুর্‌গন্ খাঁর ভগিনী।

"গুর্‌গন্ খাঁ ও দৌলত উন্নেচ্ছা ইস্পাহান হইতে পরামর্শ করিয়া জীবিকান্বেষণে বাঙলায় আসে। দলনী যখন মীর কাসেমের গৃহে বাঁদীস্বরূপ প্রবেশ করে, তখন উভয়ে উভয়ের উপকারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।"

কুল্‌সম্ তাহার পরে—যে-রাত্রে তাহারা দুইজনে গুর্‌গন্ খাঁর ভবনে গমন করে, তদ্‌বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিল। গুর্‌গন্ খাঁর সঙ্গে যে-সকল কথাবার্ত্তা হয়, তাহা দলনীর মুখে শুনিয়াছিল, তাহাও বলিল। তৎপরে দলনী সম্পর্কে একে একে সমস্ত ব্যাপারই বলিল। এ-সকল বলিয়া শেষ বলিতে লাগিল, "আমার স্কন্ধে সেইসময় সয়তান চাপিয়াছিল সন্দেহ নাই, নহিলে আমি সে-সময়ে বেগমকে কেন পরিত্যাগ করিব?" এই বলিয়া কুল্‌সম্ কাঁদিতে লাগিল।

বাঙলার নবাব,—অধোবদন। তিনি কুসুম ত্যাগ করিয়া কণ্টকে যত্ন করিয়াছেন—কুল্‌সম্‌ সত্যই বলিয়াছে—বাঙলার নবাব মূর্খ।

নবাব ওমরাহদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা শুন, এই বাঁদী যাহা বলিল, তাহা সত্য। তোমরা পার, সুবা রক্ষা কর, আমি চলিলাম। আমি ফকিরী গ্রহণ করিব।"—বলিতে-বলিতে নবাবের বলিষ্ঠ শরীর কাঁপিতেছিল—চক্ষের জল সংবরণ করিয়া মীর কাসেম বলিতে লাগিলেন,—"শুন, বন্ধুবর্গ! যদি আমাকে সেরাজউদ্দৌলার ন্যায় ইংরেজ, বা তাহাদের অনুচর মারিয়া ফেলে, তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা, সেই দলনীর কবরের কাছে আমার কবর দিও। আলি ইব্রাহিম খাঁ!"

ইব্রাহিম খাঁ উত্তর দিলেন। নবাব বলিলেন, "তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই—তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—তকি খাঁকে আমার কাছে লইয়া আইস।"

ইব্রাহিম খাঁ অভিবাদন করিয়া তাম্বুর বাহিরে গিয়া অশ্বারোহণ করিলেন।

নবাব তখন বলিলেন, "আর কেহ আমার উপকার করিবে?"

সকলেই যোড়হাত করিয়া হুকুম চাহিল। নবাব বলিলেন, "কেহ সেই ফষ্টরকে আনিতে পার?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "সে কোথায় আছে, আমি তাহার সন্ধান করিতে কলিকাতায় চলিলাম।"

নবাব ভাবিয়া বলিলেন, "আর, সেই শৈবলিনীকে? তাহাকে আনিতে পারিবে?"

মহম্মদ ইর্‌ফান যুক্তকরে নিবেদন করিল, "অবশ্য এতদিন সে দেশে আসিয়া থাকিবে, আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি।"

তাহার পর নবাব বলিলেন, "যে ব্রহ্মচারী বেগমকে মুঙ্গেরে আশ্রয়-দান করিয়াছিলেন, তাঁহার কেহ সন্ধান করিতে পার?"

মহম্মদ ইর্‌ফান বলিল, "হুকুম হইলে, শৈবলিনীর সন্ধানের পর ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে মুঙ্গেরে যাইতে পারি।"

অমাত্যবর্গ বিদায় লইলেন। তখন নবাব রত্নসিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, হীরকখচিত উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন—মুক্তার হার কণ্ঠ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—রত্নখচিত বেশ অঙ্গ হইতে দূর করিলেন।—তখন নবাব ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া 'দলনী! দলনী!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এ-সংসারে নবাবী এইরূপ!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জন্ ষ্ট্যাল্‌কার্ট

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কুল্‌সমের সঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুল্‌সম্ আত্মবিবরণ সবিস্তারে কহিতে গিয়া, ফষ্টরের কার্য্যসকলের সবিশেষ পরিচয় দিল।

তাহাতে ওয়ারেন হেষ্টিংস ফষ্টরকে কার্য্যচ্যুত করেন। ফষ্টর সেই রাগে হেষ্টিংসের ক্ষতি করিবার জন্য সঙ্কল্প করিল।

ডাইস্ সম্বর নামে একজন সুইস্ বা জার্ম্মাণ, মীর কাসেমের সেনাদলের মধ্যে সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমরু

নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উদয়নালায় যবন-শিবিরে সমরু সৈন্য লইয়া উপস্থিত হয়। ফষ্টর উদয়নালায় তাহার নিকট আসিল। প্রথমে কৌশলে সমরুর নিকট দূত প্রেরণ করিল। সমরু মনে ভাবিল, ইহার দ্বারা ইংরেজদিগের গুপ্তমন্ত্রণা সকল জানিতে পারিব। সমরু ফষ্টরকে গ্রহণ করিল। যখন আমীর হোসেন ফষ্টরের অনুসন্ধানে নিযুক্ত, তখন লরেন্স ফষ্টর সমরুর তাঁবুতে।

আমীর হোসেন কুল্‌সম্‌কে যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া ফষ্টরের অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। অনুচরবর্গের নিকট শুনিলেন যে, এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে। একজন ইংরেজ আসিয়া মুসলমান-সৈন্যভুক্ত হইয়াছে। সে সমরুর শিবিরে আছে। আমীর হোসেন সমরুর শিবিরে গেলেন।

যখন আমীর হোসেন সমরুর তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, তখন সমরু ও ফষ্টর একত্রে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আমীর হোসেন আসন গ্রহণ করিলে, সমরু জন্ ষ্ট্যাল্‌কার্ট বলিয়া তাঁহার নিকট ফষ্টরের পরিচয় দিলেন। আমীর হোসেন ষ্ট্যাল্‌কার্টের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন।

অন্যান্য কথার পর ষ্ট্যাল্‌কার্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লরেন্স ফষ্টর নামক একজন ইংরেজকে আপনি চিনেন?"

ফষ্টরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। সে মৃত্তিকাপানে দৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ বিকৃতকণ্ঠে কহিল, "লরেন্স ফষ্টর? কৈ—না।"

আমীর হোসেন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখনও তাহার নাম শুনিয়াছেন?"

ফষ্টর কিছু বিলম্ব করিয়া উত্তর করিল, "নাম—লরেন্স ফষ্টর—হাঁ—কই? না?"

তাহার কথাবার্ত্তা ও হাবভাব হইতে আমীর হোসেনের সন্দেহ দৃঢ়তর হইয়া উঠিল।

আমীর হোসেন বিদায় লইলেন। আপন শিবিরে আসিয়া কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন, তাহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে আয়।"

কুল্‌সম্‌কে সঙ্গে লইয়া আমীর হোসেন পুনর্ব্বার সমরুর তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন। কুল্‌সম্‌ বাহিরে রহিল। ফষ্টর তখনও সমরুর তাম্বুতে বসিয়াছিল। আমীর হোসেন সমরুকে বলিলেন, "যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমার একজন বাঁদী আসিয়া আপনাকে সেলাম করে।"

সমরু অনুমতি দিলেন। ফষ্টরের হৃৎকম্প হইল—সে গাত্রোত্থান করিল। আমীর হোসেন আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইলেন। কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন। কুল্‌সম আসিল; ফষ্টরকে দেখিয়া নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল।

আমীর হোসেন কুল্‌সম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ?"

কুল্‌সম্‌ বলিল, "লরেন্স ফষ্টর।"

আমীর হোসেন ফষ্টরের হাত ধরিলেন। ফষ্টর বলিল, "আমি কি করিয়াছি?"

আমীর হোসেন তাহার কথার উত্তর না দিয়া সমরুকে বলিলেন, "সাহেব! ইহার গ্রেপ্তারের জন্য নবাব নাজিমের অনুমতি আছে। আপনি আমার সঙ্গে সিপাহী দিন, ইহাকে লইয়া চলুক।"

সমরু বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "বৃত্তান্ত কি?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "পশ্চাৎ বলিব।"

সমরু সঙ্গে প্রহরী দিলেন, আমীর হোসেন ফষ্টরকে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আবার বেদগ্রাম

চন্দ্রশেখর বহুকষ্টে শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন।

বহুকাল পরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, সে গৃহ তখন অরণ্যাধিক ভীষণ হইয়া আছে। চালে প্রায় খড় নাই—প্রায় ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে ; কোথায়-বা চাল পড়িয়া গিয়াছে—গোরুতে খড় খাইয়া গিয়াছে—বাঁশবাখারী পাড়ার লোকে পোড়াইতে লইয়া গিয়াছে। উঠানে নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর হাত ধরিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী কথা কহিলেন না, কক্ষদ্বারে বসিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। চন্দ্রশেখরের কোন কথার উত্তর দিলেন না।

এদিকে পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র হইল—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া আসিয়াছেন। অনেকে দেখিতে আসিতেছিল। সুন্দরী সর্ব্বাগ্রে আসিলেন।

সুন্দরী, শৈবলিনীর ক্ষিপ্তাবস্থার কথা কিছু শুনেন নাই। দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, চন্দ্রশেখর রহিয়াছেন তবু শৈবলিনী সরিলেন না, ঘোমটাও টানিলেন না, বরং সুন্দরীর পানে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সুন্দরী বিস্মিতা হইলেন—চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিলেন—চন্দ্রশেখর সুন্দরীকে কাছে ডাকিলেন।

সুন্দরী নিকটে আসিলে, তাহার কর্ণে বলিলেন, "পাগল হইয়া গিয়াছে।"

সুন্দরী তখন বুঝিলেন। সুন্দরীর চক্ষু প্রথমে চক্‌চকে হইল,

তারপরে পাতার কোল ভিজা-ভিজা হইয়া উঠিল, শেষ জল-বিন্দু ঝরিল—সুন্দরী কাঁদিতে লাগিলেন।

সুন্দরী আসিয়া ধীরে-ধীরে চক্ষের জল মুছিতে-মুছিতে শৈবলিনীর কাছে বসিলেন—ধীরে-ধীরে কথা কহিতে লাগিলেন—ধীরে-ধীরে পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করাইতে লাগিলেন—শৈবলিনী কিছু স্মরণ করিতে পারিলেন না। শৈবলিনীর স্মৃতির বিলোপ ঘটে নাই—সুন্দরীকে মনে ছিল, কিন্তু সুন্দরীকে চিনিতে পারিলেন না।

সুন্দরী প্রথমে চন্দ্রশেখরকে আপনাদিগের গৃহে স্নানাহারের জন্য পাঠাইলেন; পরে সেই ভগ্নগৃহ শৈবলিনীর বাসোপযোগী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে প্রতাপ মুঙ্গের হইতে প্রত্যাগমন করিয়া লাঠিয়াল-সকলকে যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া, একবার গৃহে আসিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া শুনিলেন, চন্দ্রশেখর গৃহে আসিয়াছেন। ত্বরায় তাঁহাকে দেখিতে বেদগ্রামে আসিলেন।

সেইদিন রমানন্দ স্বামীও সেইস্থানে পূর্ব্বে আসিয়া দর্শন দিলেন। আহ্লাদসহকারে সুন্দরী শুনিলেন যে, রমানন্দ স্বামীর উপদেশানুসারে চন্দ্রশেখর ঔষধ-প্রয়োগ করিবেন। ঔষধ প্রয়োগের শুভলগ্ন অবধারিত হইল।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যোগবল, না PSYCHIC FORCE?

ঔষধ কি, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা সেবন করাইবার জন্য চন্দ্রশেখর বিশেষরূপে আত্মশুদ্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন—মনকে

কয়দিন হইতে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন—পারমার্থিক চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পায় নাই।

ঔষধ দিবার জন্য চন্দ্রশেখর তখন সকলকে বলিলেন, "তোমরা একবার বাহিরে যাও। আমি ডাকিবামাত্র আসিও।"

সকলে বাহিরে গেলে, চন্দ্রশেখর করস্থ ঔষধপাত্র মাটিতে রাখিলেন। শৈবলিনীকে বলিলেন, "উঠিয়া ব'স দেখি!"

শৈবলিনী মৃদু-মৃদু গীত গায়িতে লাগিলেন—উঠিলেন না। চন্দ্রশেখর স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার নয়নের প্রতি নয়ন স্থাপিত করিয়া ধীরে-ধীরে গণ্ডূষ-গণ্ডূষ করিয়া এক পাত্র হইতে ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন। তখন চন্দ্রশেখর তাঁহার ললাট, চক্ষু প্রভৃতির নিকট নানাপ্রকার বক্র-গতিতে হস্ত-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ করিতেই শৈবলিনীর চক্ষু বুজিয়া আসিল, অচিরাৎ শৈবলিনী ঢুলিয়া পড়িলেন—ঘোর নিদ্রাভিভূত হইলেন।

তখন চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী নিদ্রাবস্থায় বলিলেন, "আজ্ঞে!"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি কে?"

শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ নিদ্রিতা—কহিলেন, "আমার স্বামী।"

চ। তুমি কে?

শৈ। শৈবলিনী।

চ। এ কোন্ স্থান?

শৈ। বেদগ্রাম—আপনার গৃহ।

চ। বাহিরে কে-কে আছে?

শৈ। প্রতাপ ও সুন্দরী এবং অন্যান্য ব্যক্তি।

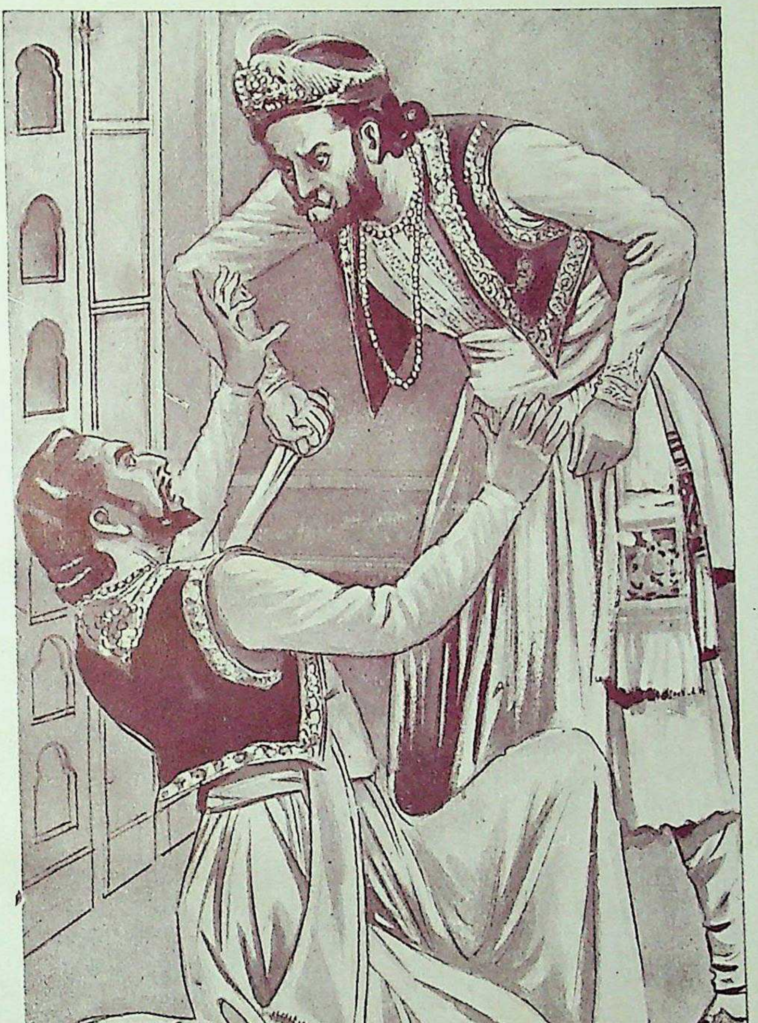

—নবাব কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন।…

[পৃষ্ঠা—১২২

চ। তুমি এখান হইতে গিয়াছিলে কেন ?

শৈ। ফষ্টর সাহেব লইয়া গিয়াছিল বলিয়া।

চ। এ-সকল কথা এতদিন তোমার মনে পড়ে নাই কেন ?

শৈ। মনে ছিল—ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছিলাম না।

চ। কেন ?

শৈ। আমি পাগল হইয়াছি।

চ। সত্য-সত্য, না কাপট্য আছে ?

শৈ। সত্য-সত্য, কাপট্য নাই।

চ। তবে, সত্য কথা বলিবে ?

শৈ। বলিব।

চ। তুমি ফষ্টরের সঙ্গে গেলে কেন ?

শৈ। প্রতাপের জন্য। এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক-বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম, ছিঁড়িয়া পৃথক্ করিয়াছিলেন কেন ?

চন্দ্রশেখর অতি-দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "যেদিন প্রতাপ ম্লেচ্ছের নৌকা হইতে পলাইল, সেদিনে গঙ্গায় সাঁতার মনে পড়ে ?"

শৈ। পড়ে।

চ। কি-কি কথা হইয়াছিল ?

শৈবলিনী সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। শুনিয়া চন্দ্রশেখর মনে-মনে প্রতাপকে অনেক সাধুবাদ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিলে কেন ?"

শৈ। বাসমাত্র। যদি পুরন্দরপুরে গেলে প্রতাপকে পাই, এই ভরসায়।

চ। বাসমাত্র—তবে কি তুমি সাধ্বী ?

শৈ। প্রতাপকে মনে-মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—এ জন্য আমি সাধ্বী নহি—মহা পাপিষ্ঠা।

চ। নচেৎ ?

শৈ। নচেৎ সম্পূর্ণ সতী।

চন্দ্রশেখর খর-খর দৃষ্টি করিয়া, হস্ত-সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "সত্য বল।"

নিদ্রিতা যুবতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন,—"সত্যই বলিয়াছি।"

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইয়া বসিলেন ; ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সকল কথা কাহাকেও বল নাই কেন ?"

শৈ। আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে ?

চ। এ-সকল কথা কে জানে ?

শৈ। ফষ্টর আর পার্ব্বতী।

চ। পার্ব্বতী কোথায় ?

শৈ মাসাবধি হইল মুঙ্গেরে মরিয়া গিয়াছে।

চ। ফষ্টর কোথায় ?

শৈ। উদয়নালায় নবাবের শিবিরে।

চন্দ্রশেখর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার রোগের কি প্রতীকার হইবে—বুঝিতে পার ?"

শৈ। আপনার যোগবল আমাকে দিয়াছেন—তৎপ্রসাদে জানিতে পারিতেছি—আপনার শ্রীচরণকৃপায় আরোগ্য লাভ করিব।

চ। আরোগ্য লাভ করিলে, কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর ?

শৈ। যদি বিষ পাই ত' খাই—কিন্তু নরকের ভয় করে।

চ। মরিতে চাও কেন ?

শৈ। এ-সংসারে আমার স্থান কোথায় ?

চ। কেন, আমার গৃহে ?

শৈ। আপনি আর গ্রহণ করিবেন ?

চ। যদি করি ?

শৈ। তবে কায়মনে আপনার পদসেবা করি ; কিন্তু আপনি কলঙ্কী হইবেন।

এই সময়ে দূরে অশ্বের পদশব্দ শুনা গেল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার যোগবল নাই, রমানন্দ স্বামীর যোগবল পাইয়াছ,— বল, ও কিসের শব্দ ?"

শৈ। ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

চ। কে আসিতেছে ?

শৈ। মহম্মদ ইর্‌ফান্‌—নবাবের সৈনিক।

চ। কেন আসিতেছে ?

শৈ। আমাকে লইয়া যাইতে—নবাব আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।

চ। ফষ্টর সেখানে গেলে পরে তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, না, তৎপূর্ব্বে ?

শৈ। না। দুইজনকে আনিতে এক সময় আদেশ করেন।

চ। কোন চিন্তা নাই, নিদ্রা যাও।

এই বলিয়া চন্দ্রশেখর সকলকে ডাকিলেন। তাহারা আসিলে বলিলেন, "এ নিদ্রা যাইতেছে। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে এই পাত্রস্থ ঔষধ

খাওয়াইও। সম্প্রতি নবাবের সৈনিক আসিতেছে—কল্য শৈবলিনীকে লইয়া যাইবে। তোমরা সঙ্গে যাইও।”

সকলে বিস্মিত ও ভীত হইল। চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ইহাকে নবাবের নিকট লইয়া যাইবে?”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “এখনই শুনিবে, চিন্তা নাই।”

মহম্মদ ইর্‌ফান্‌ আসিলে, প্রতাপ তাহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইলেন। চন্দ্রশেখর আদ্যোপান্ত সকল কথা রমানন্দ স্বামীর কাছে গোপনে নিবেদিত করিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিলেন, “আগামী কল্য আমাদের এই দুইজনকেই নবাবের দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইবে।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দরবারে

বৃহৎ তাঁবুর ভিতর উচ্চাসনে নবাব কাসেম আলি খাঁ দরবারে বসিয়াছেন। পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভৃত্যবর্গ যুক্তহস্তে দণ্ডায়মান—অমাত্যবর্গ অনুমতি পাইয়া, জানুর দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া নীরবে বসিয়া আছেন। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্দিগণ উপস্থিত।”

মহম্মদ ইর্‌ফান্‌ বলিলেন, “সকলেই উপস্থিত।”

নবাব প্রথমে লরেন্স ফষ্টরকে আনিতে বলিলেন।

লরেন্স ফষ্টর আনীত হইয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?”

লরেন্স ফষ্টর বুঝিয়াছিল যে, এবার নিস্তার নাই। এতকালের

পর ভাবিল, 'এতকাল ইংরেজ নামে কালি দিয়াছি, এক্ষণে ইংরেজের মত মরিব।'

"আমার নাম, লরেন্স ফষ্টর।"

নবাব। তুমি কোন্ জাতি?

ফষ্টর। ইংরেজ।

ন। ইংরেজ আমার শত্রু। তুমি শত্রু হইয়া কেন আমার শিবিরে আসিয়াছিলে?

ফ। আসিয়াছিলাম, সেজন্য আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন—আমি আপনার হাতে পড়িয়াছি। কেন আসিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই—জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পাইবেন না।

নবাব ক্রুদ্ধ না হইয়া হাসিলেন, বলিলেন, "জানিলাম, তুমি ভয়শূন্য—সত্য কথা বলিতে পারিবে?"

ফ। ইংরেজ কখনও মিথ্যা বলে না।

ন। বটে? তবে দেখা যাউক। কে বলিয়াছিল যে, চন্দ্রশেখর উপস্থিত আছেন? থাকেন, তবে তাঁহাকে আন।

মহম্মদ ইর্‌ফান্ চন্দ্রশেখরকে আনিলেন। নবাব চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া কহিলেন, "ইহাকে চেন?"

ফ। নাম শুনিয়াছি—চিনি না।

ন। ভালো, বাঁদী কুল্‌সম্ কোথায়?

কুল্‌সম্ আসিল; নবাব ফষ্টরকে কহিলেন, "এই বাঁদীকে চেন?"

ফ। চিনি।

ন। কে এ?

ফ। আপনার দাসী।

ন। মহম্মদ তকিকে আন।

তখন মহম্মদ ইর্‌ফান্‌, তকি খাঁকে বদ্ধাবস্থায় আনীত করিলেন।

তকি খাঁ এতদিন ইতস্ততঃ করিতেছিল, কোন্‌ পক্ষে যাই, এইজন্য শত্রুপক্ষে আজিও মিলিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাকে অবিশ্বাসী জানিয়া নবাবের সেনাপতিগণ চক্ষে-চক্ষে রাখিয়াছিলেন। আলি ইব্রাহিম খাঁ অনায়াসে তাহাকে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন।

নবাব তকি খাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন, "কুল্‌সম্‌, বল, তুমি মুঙ্গের হইতে কি প্রকারে কলিকাতায় গিয়াছিলে?"

কুল্‌সম্‌ আনুপূর্ব্বিক সকল বলিল। বলিয়া যোড়হস্তে সজলনয়নে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—"জাঁহাপনা! আমি এই আমদরবারে এই পাপিষ্ঠ স্ত্রীঘাতক মহম্মদ তকির নামে নালিশ করিতেছি, গ্রহণ করুন। সে আমার প্রভুপত্নীর নামে অপবাদ দিয়া, আমার প্রভুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, সংসারের স্ত্রীরত্নসার দলনী বেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করিয়াছে। জাঁহাপনা! পিপীলিকাবৎ এই নরাধমকে অকাতরে হত্যা করুন।"

মহম্মদ তকি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মিথ্যা কথা—তোমার সাক্ষী কে?"

কুল্‌সম্‌ বিস্ফারিতলোচনে গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"আমার সাক্ষী! উপরে চাহিয়া দেখ, আমার সাক্ষী—জগদীশ্বর। আপনার বুকের উপর হাত দে, আমার সাক্ষী—তুই। যদি আর কাহারও কথার প্রয়োজন থাকে, তবে এই ফিরিঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কর্‌।"

নবাব বলিলেন, "কেমন ফিরিঙ্গী, এই বাঁদী যাহা-যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য? তুমিও ত' আমিয়টের সঙ্গে ছিলে—ইংরেজ সত্য ভিন্ন বলে না।"

ফষ্টর যাহা জানিত, স্বরূপ বলিল, তাহাতে সকলেই বুঝিল, দলনী অনিন্দনীয়া। তকি অধোবদন হইয়া রহিল।

তখন চন্দ্রশেখর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! বাঁদীর কথা যে সত্য, আমিও তাহার একজন সাক্ষী। আমি সেই ব্রহ্মচারী।"

কুল্‌সম্‌ তখন চিনিল। বলিল, "ইনিই বটে।"

তখন চন্দ্রশেখর বলিলেন, "রাজন্‌! যদি এই ফিরিঙ্গী সত্যবাদী হয়, তবে উহাকে আর দুই-একটা প্রশ্ন করুন।"

নবাব বুঝিলেন—বলিলেন, "তুমিই প্রশ্ন কর—দ্বিভাষীতে বুঝাইয়া দিবে।"

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিয়াছ, চন্দ্রশেখরের নাম শুনিয়াছ—আমি সেই চন্দ্রশেখর। তুমি তাঁহার—"

চন্দ্রশেখরের কথা সমাপ্ত না হইতে ফষ্টর বলিল, "আপনি কষ্ট পাইবেন না। আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিব না।"

নবাব অনুমতি করিলেন, "তবে শৈবলিনীকে আন।"

শৈবলিনী আনীতা হইলেন। ফষ্টর প্রথমে শৈবলিনীকে চিনিতে পারিল না—শৈবলিনী রুগ্না, শীর্ণা, মলিনা—গায়ে খড়ি—মাথায় ধূলি—চুল আলুথালু—মুখে পাগলের হাসি—চক্ষে পাগলের দৃষ্টি! ফষ্টর শিহরিল।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকে চেন?"

ফ। চিনি।

ন। এ কে?

ফ। শৈবলিনী—চন্দ্রশেখরের পত্নী।

ন। তুমি চিনিলে কি-প্রকারে?

ফ। আপনার অভিপ্রায়ে যে দণ্ড থাকে, অনুমতি করুন। আমি উত্তর দিব না।

ন। আমার অভিপ্রায়, কুক্কুরদংশনে তোমার মৃত্যু হইবে।

ফষ্টরের মুখ বিশুষ্ক হইল—হস্তপদ কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণে ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইল, বলিল,—"আমার মৃত্যুই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, অন্যপ্রকার মৃত্যু আজ্ঞা করুন।"

ন। না। এ-দেশে একটি প্রাচীন দণ্ডের কিংবদন্তী আছে। অপরাধীকে কটি পর্য্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে, তাহার পরে তাহাকে দংশনার্থ শিক্ষিত কুক্কুর নিযুক্ত করে। কুক্কুর দংশন করিলে, ক্ষতমুখে লবণ বৃষ্টি করে। কুক্কুরেরা মাংসভোজনে পরিতৃপ্ত হইলে চলিয়া যায়, অর্দ্ধভক্ষিত অপরাধী অর্দ্ধমৃত হইয়া প্রোথিত থাকে। কুক্কুরদিগের ক্ষুধা হইলে তাহারা আবার আসিয়া অবশিষ্ট মাংস খায়। তোমার ও তকি খাঁর প্রতি সেই মৃত্যুর বিধান করিলাম।

বন্ধনমুক্ত তকি খাঁ আর্ত্ত পশুর ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। ফষ্টর জানু পাতিয়া ভূমে বসিয়া যুক্তকরে ঊর্দ্ধ-নয়নে জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিল—"আমায় রক্ষা কর।"

তারপর নয়ন বিনত করিতে ফষ্টরের দৃষ্টি তাঁবুর বাহিরে পড়িল। সহসা দেখিল, এক জটাজূটধারী, রক্তবস্ত্র-পরিহিত পুরুষ দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। যেন, সেই জটাজূটধারী পুরুষের ওষ্ঠাধর বিচলিত হইতেছে—যেন তিনি কি বলিতেছেন। ফষ্টর শুনিল, যেন তিনি বলিতেছেন, "আমি তোকে কুক্কুরের দণ্ড হইতে উদ্ধার করিব। আমার কথার উত্তর দে। তুই কি শৈবলিনীর জার?"

ফষ্টর একবার সেই ধূলিধূসরিতা উন্মাদিনীর প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিল, "না।"

সকলে শুনিল, "না! আমি শৈবলিনীর জার নহি।"

সেই বজ্রগম্ভীর শব্দে পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল—"তবে শৈবলিনী তোমার নৌকায় ছিল কেন?"

ফষ্টর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—"আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম। আমার নৌকায় রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, সে আমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু দেখিলাম যে, তাহা নহে; সে আমার শত্রু। নৌকায় প্রথম সাক্ষাতেই সে ছুরিকা নির্গত করিয়া আমাকে বলিল, 'তুমি যদি আমার কামরায় আসিবে, তবে এই ছুরিতে দুইজনেই মরিব। আমি তোমার মাতৃতুল্য!' আমি তাহার নিকট যাইতে পারি নাই, কখনও তাহাকে স্পর্শ করি নাই।" সকলে এ-কথা শুনিল।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শৈবলিনীকে তুমি কি-প্রকারে ম্লেচ্ছের অন্ন খাওয়াইলে?"

ফষ্টর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "একদিনও আমার অন্ন, বা আমার স্পৃষ্ট অন্ন সে খায় নাই, সে নিজে রাঁধিত।"

প্রশ্ন। কি রাঁধিত?

ফষ্টর। কেবল চাউল—অন্নের সঙ্গে দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুই খাইত না।

প্রশ্ন। জল?

ফ। গঙ্গা হইতে আপনি তুলিত।

এমন সময়ে সহসা শব্দ হইল—"ধুরুম্ ধুরুম, ধুম্ ধুম্!"

নবাব বলিলেন, "ও কি ও ?"

ইর্‌ফান্ কাতরস্বরে বলিল, "আর কি ? ইংরেজের কামান। তাহারা শিবির আক্রমণ করিয়াছে।"

সহসা তাঁবু হইতে লোক ঠেলিয়া বাহির হইতে লাগিল। 'দুড়ুম্ দুড়ুম্ দুম্'—আবার কামান গর্জ্জিতে লাগিল। বহুতর কামান একত্রে শব্দ করিতে লাগিল। রণবাদ্য বাজিল, পদাঘাত, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা—সৈনিকের জয়ধ্বনি সমুদ্রতরঙ্গবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল। ধূমরাশিতে গগন প্রচ্ছন্ন হইল—দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল।

সহসা নবাবের অমাত্যবর্গ এবং ভৃত্যগণ ঠেলাঠেলি করিয়া তাঁবুর বাহিরে গেল—কেহ সমরাভিমুখে—কেহ পলায়নে। কুল্‌সম্, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও ফষ্টর—ইঁহারাও বাহির হইলেন। তাঁবুমধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া রহিলেন।

সেইসময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাঁবুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তাঁবুর বাহিরে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধক্ষেত্র

শৈবলিনীকে লইয়া বাহিরে আসিয়া চন্দ্রশেখর দেখিলেন, রমানন্দ স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী বলিলেন, "চন্দ্রশেখর ! অতঃপর কি করিবে ?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এক্ষণে শৈবলিনীর প্রাণরক্ষা করি কি-

প্রকারে? চারিদিকে গোলাবৃষ্টি হইতেছে। চারিদিক্ ধূমে অন্ধকার, কোথায় যাইব?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "চিন্তা নাই—দেখিতেছ না, যেখানে যুদ্ধারম্ভেই পলায়ন, সেখানে আর রণজয়ের সম্ভাবনা কি? এই ইংরেজ-জাতি অতিশয় কৌশলময় দেখিতেছি; বোধহয়, ইহারা একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে। চল, আমরা পলায়ন-পরায়ণ যবনদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হই, তোমার-আমার জন্য চিন্তা নাই, কিন্তু এই বধূর জন্য চিন্তা।"

তিনজনে পলায়নোদ্যত যবন-সেনার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, সম্মুখে একদল সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেনা রণমত্ত হইয়া ইংরেজগণের সম্মুখীন হইতে যাইতেছে। মধ্যে তাহাদিগের নায়ক অশ্বারোহণে। সকলেই দেখিয়া চিনিলেন যে, সে প্রতাপ। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে দেখিয়া বিমনা হইয়া বলিলেন, "প্রতাপ! এ দুর্জ্জয় রণে তুমি কেন? ফেরো।"

"আমি আপনাদিগের সন্ধানেই আসিতেছিলাম। চলুন, নির্ব্বিঘ্ন স্থানে আপনাদিগকে রাখিয়া আসি।" এই বলিয়া প্রতাপ তিনজনকে নিজ ক্ষুদ্র সেনাদলের মধ্যস্থানে স্থাপিত করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। গমনকালে চন্দ্রশেখরের নিকট—দরবারে যাহা-যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে শুনিলেন। তৎপরে চন্দ্রশেখর প্রতাপকে বলিলেন, "প্রতাপ! তুমি ধন্য, তুমি যাহা জান, আমিও তাহা জানি।"

প্রতাপ বিস্মিত হইয়া চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; চন্দ্রশেখর বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "এক্ষণে জানিলাম যে ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা

করিব। করিয়া ইঁহাকে গৃহে লইব কিন্তু সুখ আর আমার কপালে হইবে না।”

প্র। কেন, স্বামীর ঔষধে কোন ফল দর্শে নাই ?

চ। এ-পর্য্যন্ত নহে।

প্রতাপ বিমর্ষ হইলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠনমধ্য হইতে তাহা দেখিতেছিলেন—শৈবলিনী একটু সরিয়া গিয়া হস্তেঙ্গিতের দ্বারা প্রতাপকে ডাকিলেন—প্রতাপ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন। শৈবলিনী অন্যের অশ্রাব্যস্বরে প্রতাপকে বলিলেন, “আমার একটা কথা কানে-কানে শুনিবে ? আমি দূষণীয় কিছু বলিব না।”

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন ; বলিলেন, “তোমার বাতুলতা কি কৃত্রিম ?”

শৈ। এক্ষণে বটে। আজি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি। আমি কি সত্য-সত্যই পাগল হইয়াছিলাম ?

প্রতাপের মুখ প্রফুল্ল হইল। শৈবলিনী তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “চুপ, এক্ষণে কিছু বলিও না। আমি নিজেই সকল বলিব। কিন্তু তোমার অনুমতি-সাপেক্ষ।”

প্র। আমার অনুমতি কেন ?

শৈ। স্বামী যদি আমায় পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন, তবে মনের পাপ আবার লুকাইয়া রাখিয়া, তাঁহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত হয় ?

প্র। কি করিতে চাও ?

শৈ। পূর্ব্বকথা সকল তাঁহাকে বলিয়া ক্ষমা চাহিব।

প্রতাপ চিন্তা করিলেন ; বলিলেন, “বলিও, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এসুখী হবার ও।” এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শৈ। আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—

প্র। সে কি শৈবলিনি ?

শৈ। যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে জানি না! এজন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।

প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ করিয়া, অশ্বে কশাঘাতপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ছুটিল।

গমনকালে চন্দ্রশেখর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও ?"

প্রতাপ বলিলেন, "যুদ্ধে।"

চন্দ্রশেখর ব্যগ্রভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যাইও না, যাইও না। ইংরেজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।"

প্রতাপ বলিলেন, "ফষ্টর এখনও জীবিত আছে, তাহার বধে চলিলাম।"

চন্দ্রশেখর দ্রুতপদে আসিয়া প্রতাপের অশ্বের বল্‌গা ধরিলেন। বলিলেন, "ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান্ তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি-আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম, সে-ই শত্রুর প্রতি হিংসা করে, যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।"

প্রতাপ বিস্মিত, পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখনও লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আপনিই মনুষ্যযোগ্য ধন্য। আমি ফষ্টরকে কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া প্রতাপ পুনরপি অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। চন্দ্রশেখর বলিলেন, "তবে যুদ্ধক্ষেত্রে যাও কেন ?"

প্রতাপ মুখ ফিরাইয়া অতি কোমল, অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার প্রয়োজন আছে।" এই বলিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই হাসি দেখিয়া রমানন্দ স্বামী উদ্বিগ্ন হইলেন, চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তুমি বধূকে লইয়া গৃহে যাও। আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। দুই-একদিন পরে সাক্ষাৎ হইবে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি প্রতাপের জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইতেছি।"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন; "আমি তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে বিদায় করিয়া দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। সেই ধূমময় আহতের আর্ত্তচীৎকারে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে প্রতাপকে ইতস্তত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কোথাও শবের উপর শব স্তূপীকৃত হইয়াছে। কেহ মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত, কাহারও অঙ্গ ছিন্ন, কাহারও বক্ষ বিদ্ধ, কেহ "জল! জল!" করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে—কেহ মাতা, ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু প্রভৃতির নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। রমানন্দ স্বামী সেইসকল শবের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না।

শ্রান্ত হইয়া রমানন্দ স্বামী এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। সেইখান দিয়া একজন সিপাহী পলাইতেছিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সকলেই পলাইতেছ—তবে যুদ্ধ করিল কে ?"

সিপাহী বলিল, "কেহ নহে। কেবল এক হিন্দু বড় যুদ্ধ করিয়াছে।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায় ?"

সিপাহী বলিল, "গড়ের সম্মুখে দেখুন।" এই বলিয়া সিপাহী পলাইল।

মধুযামিনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার

উপন্যাস

=বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসু=

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—৩৲

=বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়=

দম্পতি—৩৲

=অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত=

ছিনিমিনি—৩৲

=প্রভাবতী দেবী সরস্বতী=

আমি যারে চাই—৩৲ সোনার প্রতিমা—৩৲ পথের শেষে—৩৲

দানের মর্য্যাদা—৩৲

=নারায়ণ ভট্টাচার্য্য=

অভিমান—৩৲

=চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়=

রূপের ফাঁদ—৩৲

=শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়=

মধুযামিনী—৩৲

=অনুরূপা দেবী=

স্ত্রী—৩৲

=মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়=

জানি তুমি আসবে—৩৲

প্রত্যেকখানির দাম—২৲ টাকা

=শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়=

মাধবী রাতে পতি-দেবতা প্রিয়তমা

পতিব্রতা বিবাহ-বন্ধন তুমি আর আমি

হে মোর মানসী এলো নতুন দিন

=অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত=

নেপথ্য

=প্রেমেন্দ্র মিত্র=

মিছিল

=ফণীন্দ্র পাল=

বন্ধুর বৌ

=আশালতা সিংহ=

বিয়ের পরে

=রবীন্দ্রনাথ মৈত্র=

মায়াজাল

=প্রভাস ঘোষ=

হীরের আংটী

=প্রভাবতী দেবী সরস্বতী=

বাংলার বউ বন্ধু-স্মৃতি স্নেহের মূল্য

মহীয়সী নারী মুক্তিস্নান সহধর্ম্মিণী

প্রিয়ার রূপ

প্রত্যেকখানির দাম ২৲ টাকা

=প্রবোধকুমার সান্যাল=
সরল রেখা প্রমীলার সংসার

=করবী দেবী=
মধুমিলন সুখের বাসর

=শৈলবালা ঘোষজায়া=
শুভপরিণয় সই

=মাণিক ভট্টাচার্য্য=
অমর প্রেম স্বয়ম্বরা

=প্রমথ চট্টোপাধ্যায়=
মিলন-শঙ্খ

=হেমেন্দ্রকুমার রায়=
পথের মেয়ে

=প্রেমাঙ্কুর আতর্থী=
কল্পনা দেবী

=সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়=
জীবন-সঙ্গিনী মনের মিল প্রেয়সী
এই তো জীবন জীবন-সাথী

=পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়=
মন নিয়ে খেলা
নারীর স্বর্গ

=মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়=
নতুন বউ

=বুদ্ধদেব বসু=
মনের মত মেয়ে তুমি কী সুন্দর ক্ষণিকের বন্ধু

=সত্য মজুমদার=
বৌদিদি

=সত্য চক্রবর্ত্তী=
প্রেমের হাট

=তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়=
মালাবদল

=নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য=
বিয়েবাড়ী কালো মেয়ে যুগল-মিলন
স্বামীর ঘর গরীবের মেয়ে গিনির মালা

=নলিনাক্ষ ঘোষ=
পল্লী সতী

=নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়=
বর-কনে

=ব্যোমকেশ বন্দ্যোঃ=
হে মাধবী দ্বিধা কেন

=বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত=
বড় ঘরের মেয়ে

=হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ=
শ্রীমতী রক্তের সম্বন্ধ

=সুরেন্দ্রনাথ রায়=
পূজার ফুল

যুবক-যুবতীদের জন্য ডিটেক্‌টিভ্ গ্রন্থমালা
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত
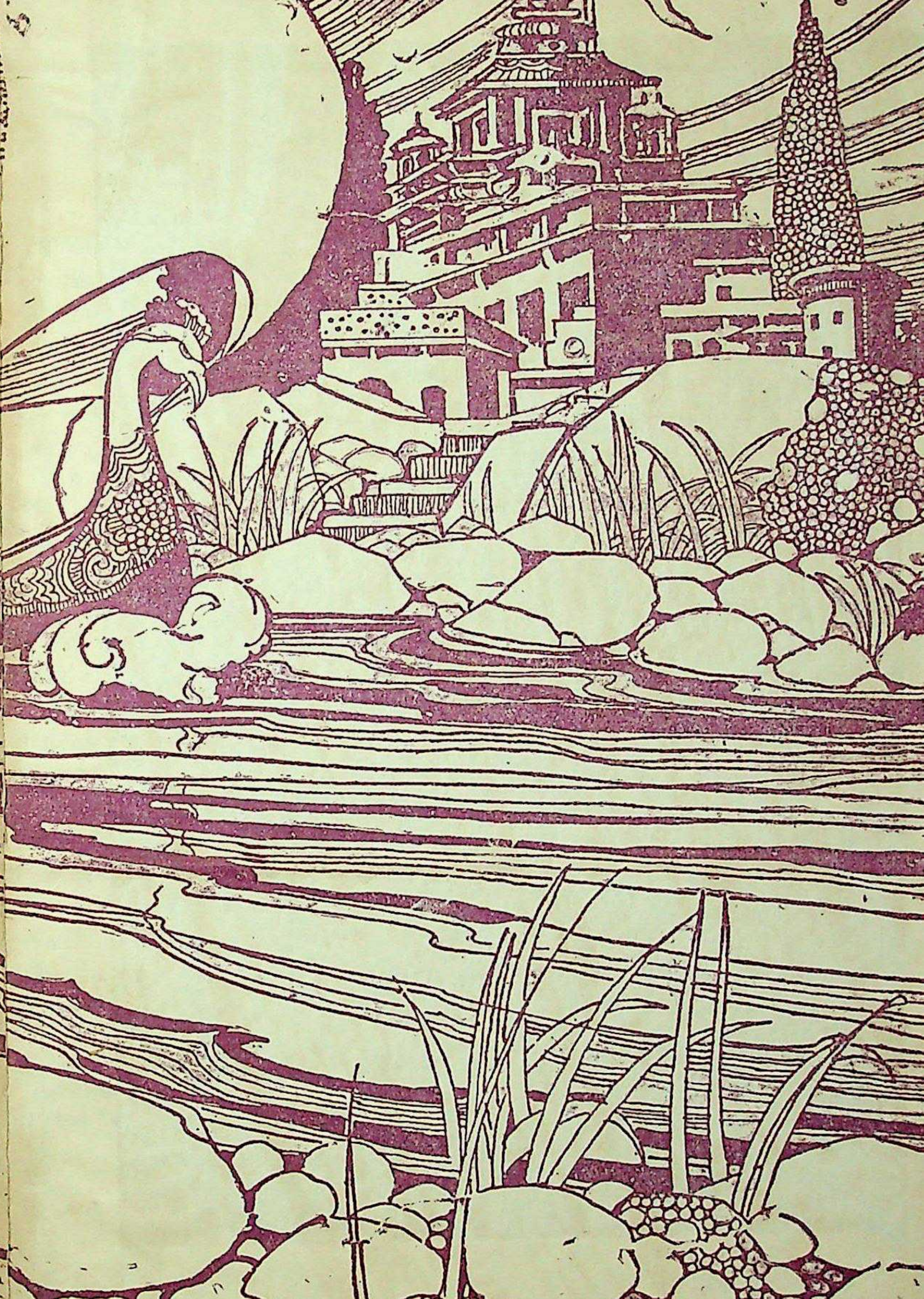
১। গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন—২৲
২। বাঘরাজের অভিযান—২৲
৩। নিশাচরী বিভীষিকা—২৲
৪। চতুর্ভুজের স্বাক্ষর—২৲